নেতৃত্বদান
Leading

৭

ব্যবস্থাপনার মুখ্য কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুন্দর, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মানসিক প্রতিমা গড়ে তোলা এবং প্রতিষ্ঠানকে সেই ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করা। এটি একটি দুরূহ চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জেরই অংশ হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়, কৌশলিক পরিকল্পনার সুতায় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতকে গ্রথিত করা হয় এবং সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। তারপরও কথা থেকে যায়। যুগোপযোগী কৌশলিক পরিকল্পনা এবং ফলপ্রসূ সাংগঠনিক কাঠামো থাকলেই যে প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব হবে তা হলফ করে বলা যায় না। এগুলোকে সাফল্যের শোভায় বিমণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে নিয়োজিত এবং কাঠামোর মধ্যে কর্মরত কর্মীদের উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সর্ব প্রকার সমর্থন দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্যের দিকে কর্মীদের মনকে রুজু রাখার ব্যবস্থাপকীয় প্রচেষ্টাকে নেতৃত্বদান প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়। নেতৃত্বদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা এ পথে ব্যক্তিক আচরণ, ব্যবস্থাপক ও যোগাযোগ, পরিচালনা ও নেতৃত্ব এবং প্রেষণার বিভিন্ন বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১: ব্যক্তিক আচরণ
পাঠ - ৭.২: ব্যবস্থাপক ও যোগাযোগ
পাঠ - ৭.৩: পরিচালনা ও নেতৃত্ব
পাঠ - ৭.৪: নেতৃত্ব তত্ত্ব
পাঠ - ৭.৫: সমকালীন প্রেক্ষাপট
পাঠ - ৭.৬: প্রেষণা

অত্র ইউনিটের অন্তর্গত দুটি পাঠ রচনাকালে লেখক কর্তৃক রচিত সাংগঠনিক আচরণ গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটি ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৭.১ ব্যক্তিক আচরণ
Individual Behavior

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাংগঠনিক আচরণ কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও মনোভাব কী তা লিখতে পারবেন।
- কর্মসন্তুষ্টি ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ হলো ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভিন্নতা। ব্যক্তির আচরণ যেমন তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি সংগঠনও প্রভাবিত হয় তার আচরণ দ্বারা। মানুষ সংগঠনের নির্মাতা আবার মানুষই সংগঠনের মৌলিক উপাদান। সাংগঠনিক আচরণ বোঝতে হলে ব্যক্তির আচরণকে বোঝতে হবে। মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি এবং ব্যক্তিত্ব। আবার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয় তার জন্মগতি এবং পরিবেশ দ্বারা। আমাদের আকার-আকৃতি একরকম হলেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার কারণে আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন আচরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা স্বাভাবিকভাবেই একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাংগঠনিক পর্যায়ে মানবিক আচরণ অনুধাবন করার কোনো বিকল্প নেই। সাংগঠনিক পর্যায়ে মানুষ যে আচরণ করে তার সাথে সামাজিক আচরণের অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সংগঠনে একজন ব্যক্তি কীভাবে ও কেন নির্দিষ্ট আচরণ করে এবং এর পেছনে কী যুক্তি বা শক্তি ক্রিয়াশীল তা জানা আবশ্যক। আমরা যদি ব্যক্তিগত আচরণ সঠিকভাবে বোঝতে না পারি তবে দলগত আচরণ বা বৃহত্তর সাংগঠনিক আচরণ পূর্ণভাবে বোঝতে পারবোনা। ব্যক্তিক আচরণ কী কী উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা জানা আবশ্যক। মানুষের আকার-আকৃতি একই রকম হলেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার কারণে তাদের আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই সংগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যক্তির আচার-আচরণ কীভাবে গড়ে ওঠে কিংবা ব্যক্তিক আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মৌল উপাদানগুলো কী সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং, মানুষের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অপরিহার্য। এ পাঠে আমরা ব্যক্তিক আচরণের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব। তবে শুরুতেই আমরা সাংগঠনিক আচরণ কী তা সম্পর্কে আলোচনা করব।

সাংগঠনিক আচরণ
Organization behavior

আচরণ বিজ্ঞানের (Behavioral Science) শাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তার মধ্যে সাংগঠনিক আচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যেখানে সংগঠনে মানবিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ দিক থেকে একে মানবিক আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা হয়। সাংগঠনিক আচরণ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আস্থা, কর্মতৃপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়। প্রতিষ্ঠান কোনো পণ্য তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে, যেমন- যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, নগদ অর্থ ইত্যাদি। কিন্তু এ উপাদানগুলো মানুষের ছোঁয়া না পেলে কোনো দ্রব্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক কার্য সম্পাদন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মানবিক সম্পর্কের ওপর।

মানবিক সম্পর্ক বলতে একদিকে যেমন শ্রমিক-ব্যবস্থাপক-মালিক সম্পর্ককে বোঝায় তেমনি শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিক-কর্মীদের আচরণের ধরন ও প্রকৃতি, তাদের প্রত্যাশা,

আবেগ, নৈরাশ্য ও আনন্দ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মৌলিক কারণ জানা আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সাংগঠনিক আচরণ কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানের অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগকে বোঝায়। আচরণ বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন প্রথিতযশা মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণপূর্বক আমরা বলতে পারি, কোনো সংগঠনে মানুষের আচরণ নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ, সংবেদনশীলতা, মনোভাব, প্রেষণা, দ্বন্দ্ব বা হতাশা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তারা নানাভাবে সাড়া দিয়ে থাকে যা সংগঠনের পক্ষে-বিপক্ষে যেতে পারে। তাই তাদের আচরণকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি মানুষের বিচিত্র আচরণের জন্য যেমন প্রভাব বিস্তার করে ঠিক তেমনিভাবে সমাজ জীবন হতে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষের শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো (Learned Characteristics) হচ্ছেঃ ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, অভিপ্রায়, দক্ষতা, মূল্যবোধ, প্রত্যক্ষণ এবং পরিবেশ। সংশ্লিষ্ট এ সকল বিষয়াদি আমাদের জানা দরকার। আসুন এক এক করে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি।

ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও মনোভাব

Personality, values and attitudes

ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ (Personality and environment): 'ব্যক্তিত্ব' পদবাচ্যটির সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ নয়। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে পৃথক সত্তার অধিকারী। এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, কোন লোক কাজের জন্য উপযুক্ত তা নির্ণয় করা। আচরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নম্র ও বিনয়ী হয়; কেউবা হয় উগ্র, রুক্ষ ও প্রতাপশালী। কিছু লোক প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী হয় ও কাজ কর্মে প্রসন্ন থাকে। আবার অনেকে গম্ভীর, বিষণ্ণ ও বেরসিক হয়। অনেকে কর্মঠ আবার অনেকে অলস ও ধীরগামী হয়; কেউবা নির্বোধ আবার কেউবা বুদ্ধিমান হয়। সুতরাং, ব্যক্তিত্বের ধরন মতে মানুষকে নানা শ্রেণিভুক্ত করা যায় এবং সেভাবে তাদেরকে পরিচালিত ও সংগঠিত করা যায়।

পরিবেশ বলতে ব্যক্তির গণ্ডি বা পরিবেষ্টনীকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তাই হলো তার পরিবেশ। মনোবিজ্ঞানে পরিবেশ শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব উদ্দীপক ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে তার পরিবেশ। ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির বিকাশে জন্ম-পূর্ব পরিবেশ এবং জন্ম-উত্তর পরিবেশ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম-পূর্ব পরিবেশ বলতে মায়ের খাদ্য, পুষ্টি, আবেগ, ঔষধ সেবন, রক্তের উপাদান ইত্যাদিকে বোঝায়। এগুলো গর্ভস্থ শিশুর বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। জন্ম-উত্তর পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়। এ সবকিছুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচরণের বিকাশে তাৎপর্য ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ (Values): সাংগঠনিক আচরণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা মনোভাব ও প্রেষণা বোঝার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি স্থাপন করে এবং আমাদের প্রত্যক্ষণকে (perception) সরাসরি প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে তার কর্মজীবন শুরুর সময় কী তার ''কর্তব্য'' এবং কী ''কর্তব্য না'' এর পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে প্রবেশ করে। অবশ্যই এ ধারণাগুলো মূল্যবোধবিহীন নয়। শুধু তাই নয়, "সঠিক" এবং কী "সঠিক নয়" এ সম্পর্কেও তারা তাদের নিজস্ব ধারণা বহন করে। মূল্যবোধ মানুষের মনোভাব ও আচরণকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি এটা ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে যেসব সহায়ক কাজ করে তা হলো- পরিবার, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনকানুন, সংবিধান, সংস্কৃতি, নীতিবোধের চর্চা, সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সভাসমিতি, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, সামাজিক অনুষ্ঠান, নাগরিক চেতনা, সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি।

মনোভাব (Attitudes): কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা বা বস্তুর প্রতি যে অনুভূতি, বিশ্বাস ও আচরণ প্রকাশ করে তাকেই মনোভাব বলা হয়ে থাকে। মনোভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুরকমেরই হতে পারে। ব্যক্তির মনোভাব তার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকে গড়ে ওঠে। সুতরাং, কোনো বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদান ব্যক্তির মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল নীরবতা বা কর্মের মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করা যায়। তবে মতামত মনোভাবের বাচনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মনোভাব

এবং মূল্যবোধ একই জিনিস নয়, কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। সাংগঠনিক আচরণে মূল্যবোধ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি মনোভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, কোনো বস্তু বা ঘটনার প্রতি কর্মীদের অনুভূতি ও বিশ্বাস যা তাদের নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের বিষয়ে নির্দিষ্ট আচরণ করতে প্রভাবিত করে। যেমন-কর্মীদের দিয়ে একই বেতনে কিংবা কম বেতনে বেশি সময় ধরে কাজ করানো, এখানে বোঝার বিষয় কীভাবে সুপারভাইজরের মধ্যে এ মনোভাবের জন্ম নিয়েছে, প্রকৃত কর্ম-আচরণের সাথে তার এ মনোভাবের সম্পর্ক এবং কীভাবে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

একজন মানুষের হাজার ধরনের মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু সাংগঠনিক আচরণে শুধুমাত্র কর্ম-সম্পর্কিত মনোভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাংগঠনিক আচরণের ওপর পরিচালিত বেশিরভাগ গবেষণা তিন ধরনের মনোভাবের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে- কর্মসন্তুষ্টি, কর্ম সম্পৃক্ততা এবং সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি। তন্মধ্যে কর্মীদের 'কর্মসন্তুষ্টি' বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। আসুন কর্মসন্তুষ্টি সম্পর্কে জেনে নেই।

কর্মসন্তুষ্টি
Job satisfaction

সাধারণভাবে কাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতিকে কর্মসন্তুষ্টি বলে। এ অনুভূতি হচ্ছে কর্মীর মনোভাব। কর্মক্ষেত্রে কর্মীকে তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়, প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, কর্মসম্পাদন মান বজায় রাখতে হয়, কার্য পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তাকে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। এ থেকে বোঝা যায়, কর্মী কর্মের প্রতি কতখানি সন্তুষ্ট তা নির্ধারণ করা খুবই জটিল একটি কাজ। এ জটিলতার মূল কারণ হচ্ছে- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতন ইত্যাদি তারতম্যহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে মতপার্থক্য। বস্তুত সংগঠনের কার্যক্রম ও পরিবেশ, সংগঠনের নীতি ও প্রশাসন, প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কর্মীদের যে অনুকূল ও প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি হয় তাকে কর্মসন্তুষ্টি বলে।

কর্মীদের কর্মসন্তুষ্টি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। তবে, একজন সন্তুষ্ট কর্মী অধিক উৎপাদনক্ষম নাও হতে পারে। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, কম উৎপাদনক্ষম কর্মীকে বেশি কষ্টের কাজ করতে হয়না বলে সে তার কাজে সন্তুষ্ট থাকে। কর্মীদের কর্মসম্পাদন ও কর্মসন্তুষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হলেও এদের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, কর্মসন্তুষ্টি কর্মসম্পাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবিত হবার কারণ হচ্ছে- কর্মীরা তাদের কর্মসম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, উদ্দীপনা ও প্রেষণা পেয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষণ
Perception

সাংগঠনিক আচরণে প্রত্যক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? সহজভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত হয় তার প্রত্যক্ষণের ওপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি যা প্রত্যক্ষণ করে তাই সে বাস্তব মনে করে এবং সে অনুযায়ী সে আচরণ করে থাকে। ব্যক্তির এ আচরণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষণগত পর্যায় হলো চিন্তনের প্রাথমিক ও সহজতর পর্যায়। যখন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বার্তা থেকে আমাদের মধ্যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তখন মস্তিষ্ক সাথে সাথে তার একটি মানসিক চিত্র প্রস্তুত করে। আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা এর একটি ব্যাখ্যা তৈরি করি। এ ব্যাখ্যাটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। উদ্দীপক এক হলেও প্রত্যক্ষণ সব সময় এক হয়না। ব্যক্তির আবেগ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উদ্দীপকের অর্থ বদলে যায়।

আলোচ্য বিষয়গুলো একজন কর্মীর আচরণে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে বলে একজন ব্যবস্থাপককে এ বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, একজন ব্যবস্থাপকের জন্য 'যোগাযোগ' বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ একটি শিল্প। ব্যবস্থাপক যাই করে থাকেন এর সবকিছু যোগাযোগ সম্পৃক্ত। ব্যবস্থাপক যত এ শিল্পটিকে রপ্ত করতে পারবেন ততোই তিনি সফল হবেন। পরবর্তী পাঠে আমরা যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৭.২ ব্যবস্থাপক ও যোগাযোগ
Managers and Communication

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যোগাযোগ কী তা বলতে পারবেন।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- যোগাযোগের পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুধু যোগাযোগ আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে না, কর্ম-জীবনেও যোগাযোগের প্রভাব অপরিসীম। যারা শিল্পকারখানা, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংগঠনে কাজ করে তাদের কর্মচঞ্চল জীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই যোগাযোগের বিপুল ভূমিকা বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক-কর্মচারীর যোগাযোগে দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের সাফল্য যোগাযোগের সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত।

মানব জীবনে 'যোগাযোগ' প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন্মলগ্ন হতে চির শায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগের মধ্যেই অতিবাহিত করতে হয়। সামাজিক জীবন বলুন, ধর্মীয় জীবন বলুন, অর্থনৈতিক জীবন বলুন, রাজনৈতিক জীবন বলুন, যেরূপ জীবনের কথাই বলুন না কেন, পারস্পরিক নির্ভরতা থাকলে সেখানে আপনাকে যোগাযোগ করতেই হবে। নতুবা জীবন অচল হয়ে পড়বে। এ যোগাযোগ আপনি অনেকভাবে করতে পারেন- কথা বলে, শব্দ করে, কেঁদে, হেসে, মুখ বাঁকা করে, নাক কুঁচকিয়ে, ভ্রু নেড়ে, কপালের রেখা কুঞ্চন করে, অঙ্গভঙ্গি করে, গলা খাঁকারি দিয়ে, আরও কতো কী! আপনি যদি ব্যবসায়ী হন কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তবে আপনাকে কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে কাটাতে হবে। আর যেহেতু প্রতিষ্ঠান একই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য অনেকগুলো মানুষের সমাহার সেখানে আপনাকে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে, কথাবার্তা বলতে হবে, ঊর্ধ্বতনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, অধীনস্থ লোকদের সাথেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ লিখে হোক অথবা পড়ে হোক, আপনাকে যোগাযোগ করতেই হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে আপনি এই যে যোগাযোগ করছেন, এটাই ব্যবসায় যোগাযোগ। এ যোগাযোগে আপনাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হবে। তবেই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে আপনি অবদান রাখতে পারবেন– আপনার অবদান স্বীকৃত হবে। আর ব্যবসায় যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন করতে হলে যোগাযোগের বিভিন্ন কলাকৌশল, নীতিমালা, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ পাঠে আমরা যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করব।

যোগাযোগ কী
What is communication

মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বা তথ্য বিনিময় করে। ভাব বা তথ্যের এ বিনিময় কার্যকেই যোগাযোগ নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণিও বিশেষ বিশেষ 'ডাক' ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে

যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন করে। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণির ভাব কিংবা অনুভূতি বিনিময়সংক্রান্ত যে কোনোরূপ আচরণকেই যোগাযোগ হিসেবে গণ্য করা যায়। সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কিংবা সচেতন বা অবচেতন মনে অনুভূতি, মনোভাব ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশই হলো যোগাযোগ। মারফি ও পেক নামক দুজন যোগাযোগ-বিজ্ঞানী যোগাযোগকে ধারণা বা তথ্য বিনিময়ের দুতরফা প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করেছেন।

সাধারণভাবে 'যোগাযোগ' (communication) বলতে কথাবার্তা, পত্র বা সংবাদাদির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করাকে বোঝায়। দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে চিন্তাধারা, বিশেষ ঘটনার বিবরণ, অনুভূতি বা মতামত বিনিময় হলে তাকে 'যোগাযোগ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক লোক প্রয়োজনানুযায়ী অন্য লোকের সাথে বিভিন্ন উপায়ে বার্তা আদানপ্রদান করে। এ কাজ সে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে সম্পাদন করতে পারে কিংবা চিঠি লিখে বা টেলিফোন, ইমেইল করেও অন্যের সাথে খবরাখবর বিনিময় করতে পারে। যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন কেউ তার অভিপ্রেত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্তা বিনিময় করে তখন তাকে যোগাযোগ নামে চিহ্নিত করা হয়। কেউ কেউ যোগাযোগকে একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অথবা এক প্রতিষ্ঠান ও আরেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান হয় তাকে যোগাযোগ বলা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রধানত, তিনটি উপাদান জড়িতঃ (১) বার্তা প্রেরক (sender), (২) বার্তা প্রাপক (receiver) ও (৩) বার্তা (message)। প্রেরক প্রাপকের নিকট বার্তা প্রেরণ করলে অথবা প্রাপক বার্তা প্রাপ্তির পর প্রেরককে তার প্রতিক্রিয়া জানালে 'যোগাযোগ'-এর সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, যোগাযোগ হলো যে কোনো কার্যকর পন্থায় পারস্পরিক ভাব বিনিময়। মানুষ বিভিন্ন উপায়ে একে অপরের সাথে ভাব বা চিন্তাধারা বিনিময় করতে পারে। মানুষের এ ভাব বিনিময়ের বিষয়টিই যোগাযোগ নামে পরিচিত। তাহলে ব্যবসায়িক যোগাযোগ কী? অন্যদিকে,

ব্যবসায়িক যোগাযোগঃ ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাদির আদানপ্রদান হলে তাকে ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়। এরূপ যোগাযোগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভিন্ন লোকের মধ্যে হতে পারে অথবা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মীর সাথে বাইরের লোকেরও হতে পারে। তবে বাইরের লোকের সাথে যোগাযোগের বিষয়বস্তু ব্যবসায় সংক্রান্ত হলেই তা ব্যবসায় যোগাযোগের সংজ্ঞায় পড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবসায় সংক্রান্ত যোগাযোগ অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া উচিত। সামাজিক যোগাযোগের ন্যায় আমরা এখানে শুধুমাত্র ভাব আদানপ্রদান করে সন্তুষ্ট হই না, এর পরিবর্তে আমরা যথোপযুক্ত কার্য ও সহযোগিতা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক যোগাযোগে ''আমি বড্ড পরিশ্রান্ত'' বা ''আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি''– এ কথাটুকু বলেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি। কিন্তু ব্যাবসাবাণিজ্যে যোগাযোগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এখানে ব্যবস্থাপক যখন কোনো অধস্তন কর্মচারীর সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করেন তখন তিনি সেই কর্মচারীর নিকট থেকে সাধারণত উত্তর প্রত্যাশা করেন। তেমনি অধস্তন কর্মচারীরাও ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তার অভীপ্সা অনুযায়ী কার্য হোক তা প্রত্যাশা করে। যোগাযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবহিতি একজন ব্যবস্থাপককে তার যোগাযোগ কার্যের উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে। তাই ব্যবস্থাপকদের উচিত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যোগাযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া

Communication process

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলি বা কার্যক্রমের গতিপ্রবাহকে প্রক্রিয়া বলা হয়। সাধারণভাবে 'প্রক্রিয়া' বলতে কোনো কিছু করার পদ্ধতিকে বোঝায়, যার সাথে অনেকগুলো পদক্ষেপ জড়িত থাকে। যোগাযোগ প্রক্রিয়া বলতে একটি বার্তা প্রেরণ থেকে আরম্ভ করে গ্রহণ পর্যন্ত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। আমরা যখন কারো সাথে যোগাযোগ করি তখন তার নিকট একটি বার্তা বা তথ্য (message) পাঠাই। উৎসস্থল থেকে এনকোডিং (নির্দিষ্ট একটি রূপে পরিবর্তিত হওয়া) হয়ে বার্তায় রূপান্তরিত হওয়ার পর কোনো একটি মাধ্যমের সাহায্যে গ্রহীতার কাছে বার্তাটি ডিকোডিং (পাঠোদ্ধারযোগ্য) হওয়ার যে গতিধারা তাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। যোগাযোগের সাথে অনেকগুলো উপাদান বিজড়িত, যেমন- বার্তা প্রেরক, এনকোডিং, মাধ্যম, ডিকোডিং, বার্তা গ্রহীতা এবং ফলাবর্তন। এ প্রক্রিয়া চলাকালীন চারপাশের বিভিন্ন ধরনের শব্দ বা বাধাদানকারী আওয়াজের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। এ উপাদানগুলো যখন একই সূত্রে গ্রথিত হয় তখনই তা যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রূপ ধারণ করে। চিত্র ৭.১ লক্ষ করুন।

সহজভাবে বলা যায়, যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপাদান নিহিত আছে: (ক) যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক, (খ) বার্তা ও (গ) বার্তা গ্রহীতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহীতার মধ্যে বার্তা চলাকালে আরও অনেকগুলো উপাদান কাজ করে থাকে। তাই পরিবর্তিত প্রেক্ষপটে আমরা যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে: যোগাযোগকারী একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও ঘটনাকে সম্মুখে রেখে একটি ধারণা (অনুভূতি, আবেগ, মতামত ইত্যাদি) প্রকাশ করেন এবং প্রাপকের নিকট তা প্রেরণ করেন ও তার নিকট থেকে প্রত্যুত্তর পেয়ে থাকেন। বার্তা-প্রেরক, বার্তা ও বার্তা-গ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্ক দ্বারা যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত হয়।

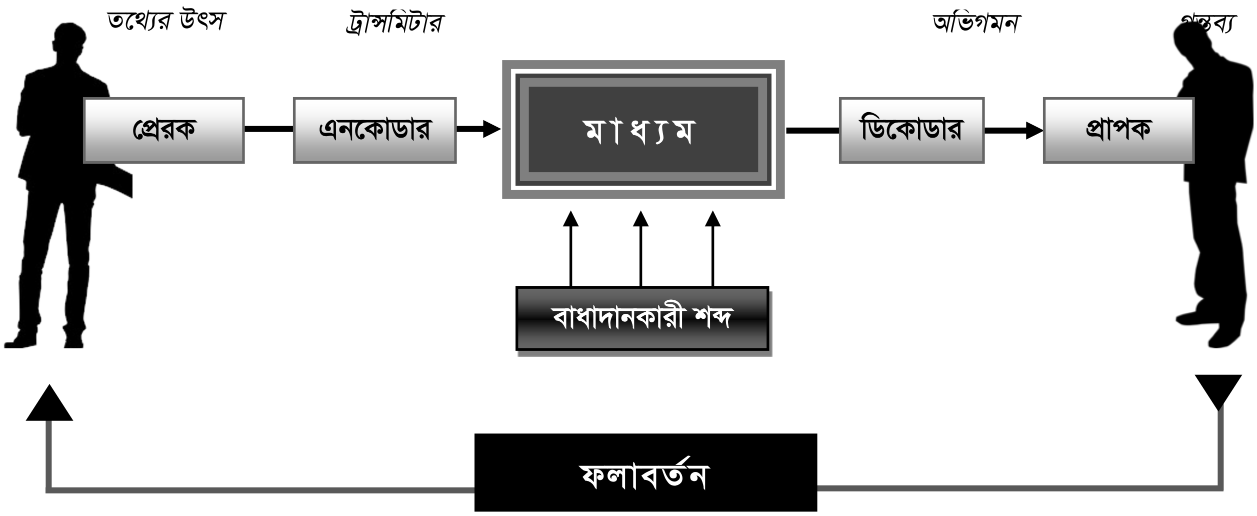

চিত্র ৭.১: যোগাযোগ প্রক্রিয়া (চিত্র উৎস: Zahed Mannan, Business Communication: Strategies for Success in Business and Professions, University Grants Commission, Bangladesh, 2016)

অধিকাংশ যোগাযোগে ফলাবর্তন (feedback) একটি অপরিহার্য প্রত্যাশা। যিনি অন্যের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি সেই 'অন্য ব্যক্তিটির' নিকট থেকে একটি উত্তর আশা করেন। উত্তর ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, যোগাযোগকারী তার প্রেরিত বার্তার উত্তর কামনা করেন। এ কারণে যোগাযোগ উত্তর প্রাপ্তি বা ফলাবর্তনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

যোগাযোগ কয়েক প্রকারের হতে পারে। আসুন এ সম্পর্কে জেনে নেই।

যোগাযোগের প্রকারভেদ

Types of communication

যোগাযোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ব্যবস্থাপক তার প্রয়োজন অনুযায়ী কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো অনুযায়ী যেকোনো ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণির যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১. **সমান্তরাল যোগাযোগ (Horizontal communication):** বিভিন্ন বিভাগের একই মর্যাদা বা প্রায় একই মর্যাদাসম্পন্ন লোকজনের মধ্যে যে যোগাযোগ হয় তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলা হয়। সমমর্যাদা বা সমপর্যায়ের লোকজন, বিভিন্ন বিভাগ বা বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংবাদ বিনিময়ের প্রক্রিয়া সমান্তরাল যোগাযোগ নামে পরিচিত। মনে করুন, বিক্রয় বিভাগের হিসাবরক্ষক উৎপাদন বিভাগের হিসাবরক্ষকের নিকট একটি তথ্য চেয়ে চিঠি দিল। প্রাপক হিসাবরক্ষক সেই তথ্য জানিয়ে ক্রয় বিভাগের হিসাবরক্ষকের নিকট আরেকটি চিঠি (প্রত্যুত্তর) পাঠাল। এ যেগাযোগটি সমান্তরাল যোগাযোগ হবে, কারণ দুজনই একই পদমর্যাদা সম্পন্ন। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বিভাগ থাকতে পারে– উৎপাদন বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, অর্থ বিভাগ, হিসাবসংরক্ষণ বিভাগ, নগদান বিভাগ, শ্রমিক-কর্মচারী বিভাগ, মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অবস্থিত এসব বিভাগের বিভিন্ন ব্যবস্থাপক বা সমপদমর্যাদার কর্মচারীদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করা হলে তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলা হবে।

২. **লম্বিক যোগাযোগ (Vertical communication):** এখানেও দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে একজনের পদমর্যাদা আরেক জনের চেয়ে উচ্চমানের হয়। এ ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ঊর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী দুরকমেরই হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় ঊর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী যোগাযোগের সমন্বয়ে লম্বিক যোগাযোগ তৈরি হয়।

৩. **ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ (Upward communication):** ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ নিম্নগামী যোগাযোগেরই বিপরীত গতি প্রবাহ। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্যের স্রোতধারা ওপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়, আর ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগে তা নিচ থেকে ওপরের দিকে প্রবাহিত হয়। অধীনস্থ কর্মচারীরা যখন তাদের বসের সাথে সংবাদ বিনিময় করে বা নিম্নপদস্থ লোকজন যখন উচ্চপদস্থ যে কোনো লোকজনের সাথে তথ্য বিনিময় করে তখন সেই সংবাদ বা তথ্য-বিনিময় ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ নামে অভিহিত হয়। নিম্নগামী যোগযোগের মতো এখানেও সংবাদ বিনিময়ের পক্ষসমূহ একই থাকে, পার্থক্য শুধু উদ্যোগে। নিম্নগামী যোগাযোগে তথ্য প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে অধীনস্থ কর্মচারী এবং তথ্য গ্রহণ করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কাজেই উভয় প্রকার যোগাযোগে পার্থক্য অতি অল্প। যেমন- একজন শ্রমিক তার বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে চাইলে সে প্রথমে এটা তার বিভাগের সুপারভাইজরের গোচরীভূত করে। এ আবেদন সহকারী ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক প্রমুখের হাত ঘুরে মহাব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে পৌঁছে। এভাবে ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগের সূত্রপাত হয় নিম্ন স্তরে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে উচ্চ স্তরে। আবার সুপারভাইজর ব্যবস্থাপকের সাথে অথবা ব্যবস্থাপক সহকারী মহাব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করলে তাও ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ নামে পরিচিত।

৪. **নিম্নগামী যোগাযোগ (Downward communication):** ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করে, তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলা হয়। এরূপ যোগাযোগে সংবাদাদি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ধাপ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে ঘুরে প্রতিষ্ঠানের নিম্নতম ধাপে পৌঁছে। যেমন- মহাব্যবস্থাপক একটি নির্দেশ শ্রমিকদের সুপারভাইজরের নিকট পৌঁছাতে চাইলে প্রথমে তিনি তা সংশ্লিষ্ট সহকারী মহাব্যবস্থাপকের নিকট প্রেরণ করেন। সহকারী মহাব্যবস্থাপক এ নির্দেশনামা যথারীতি ব্যবস্থাপকের দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। তখন তা ব্যবস্থাপক ও সহকারী ব্যবস্থাপকের হাত ঘুরে সুপারভাইজরের নিকট পৌঁছে। এভাবে একটি তথ্য যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট হতে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর নিকট পৌঁছে, তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ নামে অভিহিত করা হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য ও সংবাদ নিম্নে 'গমন' করে বলে এটাকে বলা হয় নিম্নগামী যোগাযোগ।

৫. **অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ (Internal communication):** একটি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বিভিন্ন অফিসার বা কর্মচারীদের মধ্যে যেসব লিখিত ও মৌখিক সংবাদ বিনিময় হয় তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কর্মরত নন এমন লোকের সাথে যেসব যোগাযোগ করা হয় তা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের আওতায় আসে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় কর্মী যখন বিক্রয় কর্মীদের নিকট কোনো চিঠিপত্র পাঠায় তা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু অপর একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কর্মীর নিকট কোনো দ্রব্যের ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়ে চিঠি প্রেরণ করলে তা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে গণ্য হবে না। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার হতে পারে। তবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের আধিক্যই বেশি। এ যোগাযোগ সমান্তরাল অথবা লম্ব, ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী হতে পারে।

৬. **বাহ্যিক যোগাযোগ (External communication):** অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ন্যায় বাহ্যিক যোগাযোগও একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই বাইরের জগতের সাথে বিভিন্ন কারণে যোগাযোগ করে থাকে। বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং কোম্পানি, বিমা কোম্পানি, সরকারি এজেন্সি, চেম্বার অব কমার্স, বিভিন্ন পাওনাদার ও দেনাদার, শেয়ারহোল্ডার প্রমুখের সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে বহির্বিশ্বে নিজের কার্যাবলি প্রচার করে সুনাম বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত যেসব যোগাযোগ করা হয় তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে। একটি ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফট বা ঋণ নেওয়ার জন্য চিঠিপত্র আদানপ্রদান করলে তা যেমনি বাহ্যিক যোগাযোগ, ঠিক তেমনি কোনো ফার্মের নিকট কাঁচামাল সরবরাহের ফরমায়েশ দিলে তাও বাহ্যিক যোগাযোগ। একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই বাহ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনসংযোগ রক্ষা করতে হয়।

৭. **আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Formal communication):** প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যে সমস্ত তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া সাংগঠনিকভাবে অনুমোদিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ব্যবস্থারই নামান্তর। কারণ এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাবলি ও সমস্যার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যবস্থাপকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। ব্যবস্থাপকগণ সে তথ্যের আলোকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত ও প্রণীত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যাবলি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ফলে নিম্ন স্তরে বিভিন্ন লোকজনের নিকট পৌঁছে। সে মোতাবেক কর্মচারীরা কার্য সম্পাদন করতে পারে। এটা ব্যবস্থাপনা মইয়ের ওপরের ধাপগুলোতেও তথ্য সরবরাহ করে এবং সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য অপরিহার্য পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমান্তরাল যোগাযোগ পরিধি বিস্তৃত করে। তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও সম্প্রচারিত করার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো একটি ব্যাপক পদ্ধতির (system) সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ভিত্তিমূল। কারণ একটি আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ থেকে এরূপ যোগাযোগের উদ্ভব। যখন একটি প্রতিষ্ঠানে কোনো কাজ করার জন্য কারও নিকট কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ (delegation of authority and responsibility) করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটি উর্ধ্বগামী যোগাযোগ লাইনের সৃষ্টি হয়– নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে (যিনি কাজ করার জন্য কর্তৃত্ব পেয়েছেন) উর্ধ্বতনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করতে হয় যাতে তিনি বোঝতে পারেন, কর্মচারী তার নিকট প্রদত্ত কর্তৃত্ব অনুযায়ী কাজ করছেন কি না। অনুরূপভাবে সেখানে একটি নিম্নগামী যোগাযোগ লাইনের সৃষ্টি হয় যেখানে কর্মচারী উচ্চপদস্থ লোকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। আসলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের স্বাভাবিক লাইনকে অনুসরণ করে। আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো ডিজাইন করতে গেলে সাংগঠনিকভাবে অনুমোদিত একটি যোগাযোগ চ্যানেলের সৃষ্টি হয়।

৮. **অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal communication):** প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা বাইরে প্রতিষ্ঠানের বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব যোগাযোগ হয় যা সাংগঠনিকভাবে অনুমোদিত নয় বা যা আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায় না, তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। ননঅফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য বিনিময়ের জন্য অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তুললে সেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের উৎপত্তি হয়। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত সাংগঠনিক যোগাযোগ পরিবাহিত হলেও প্রতিষ্ঠানের সব সদস্যেরই এটা জানা থাকে যে, অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমেও বহু তথ্য আদানপ্রদান করা হয়। একজন কর্মচারী একটি তথ্য তার সহকর্মীর নিকট থেকে শোনতে পারে অথবা দারোয়ান বা পিয়নের কাছ থেকে শোনতে পারে কিংবা বাড়িতে স্ত্রীর কাছে শোনতে পারে। স্ত্রী হয়তো তা অন্য এক কর্মচারীর স্ত্রীর কাছে শোনেছেন। প্রত্যেক কর্মচারীই তার দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনকালে বিভিন্ন জনের সাথে মিলামিশার সময়, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, চা খাবার অবসরে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত অনেক তথ্যের আদানপ্রদান করে থাকে। যখন অনেক লোক একই স্থানে একত্রে মিলেমিশে কাজ করে তখন সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের সৃষ্টি হয়।

আসলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের পক্ষে কর্মসংক্রান্ত সমস্যার জন্য অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল ব্যবহার করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রতিষ্ঠানে যারা বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে তারা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রায়শঃই অনানুষ্ঠানিক তথ্য-উৎস ব্যবহার করে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যখন কর্মীরা হিমহিস খেতে থাকে, তখন অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য তাদের সমস্যা সমাধানের পথে প্রশান্তির আমেজ ছড়িয়ে দেয়। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মতো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের মতো ঘুরপাক খায় না বলে সব বিভাগের কর্মীরাই এরূপ যোগাযোগ দ্বারা উপকৃত হয়।

আলোচ্য যোগাযোগের ধরনগুলো বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে? কোন পদ্ধতি কোন ধরনের যোগাযোগের জন্য উত্তম হবে? এ পদ্ধতি সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপকের জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক তেমনি সকল কর্মীদেরও এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উত্তম। আসুন সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নেই।

যোগাযোগ পদ্ধতি

Methods of communication

যোগাযোগ পদ্ধতি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। যোগাযোগে যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, এতে ভাষায় সাহায্য নিতে হয়। কাজেই যোগাযোগের পদ্ধতিগুলো আলোচনার পূর্বে ভাষার ওপর কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

<u>ভাষা কী:</u> মানুষের চিন্তাধারা এবং ভাবাবেগের প্রকাশ ও আদানপ্রদানের জন্য যে সব সংকেত ব্যবহার করা হয়, সেসব সংকেত ব্যবহারের পদ্ধতিকে ভাষা বলে। ভাষা মৌখিক ও অমৌখিক উভয় প্রকারের হতে পারে। শব্দের ওপর ভিত্তি করে ভাব প্রকাশের পদ্ধতিকে মৌখিক ভাষা বলে।

অপরপক্ষে, হাসি এবং ভাবভঙ্গি, কার্যাবলি, নীরবতা, ছবি, চার্ট, মডেল, গ্রাফ অথবা অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা বা গাণিতিক চিহ্ন দ্বারা অমৌখিক ভাষা প্রকাশ করা হয়। আবার মৌখিক ভাষা বাচনিক ও লিখিত উভয় প্রকারের হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবসায়িক যোগাযোগে অমৌখিক ভাষার চেয়ে মৌখিক ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। প্রকাশের মাধ্যম অনুসারে যোগাযোগকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. বাচনিক (বা মৌখিক) যোগাযোগ
২. লিখিত যোগাযোগ
৩. ভাবসূচক যোগাযোগ বা অমৌখিক যোগাযোগ
   (ক) অঙ্গসঞ্চালন যোগাযোগ
   (খ) নীরব যোগাযোগ
৪. চাক্ষুষ বা ভিজুয়াল যোগাযোগ

আসুন এ পদ্ধতিগুলো কী তা সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই।

⊙ বাচনিক বা মৌখিক যোগাযোগ (Oral communication or verbal communication): 'বচন' থেকে বাচনিক কথাটির উৎপত্তি। বচন মানে কথা। তাই কথা বা বচন দ্বারা কেউ অন্যের সাথে ভাব বিনিময় করলে তাকে বলা হয় বাচনিক যোগাযোগ। বাচনিক যোগাযোগ হলো ভাবের অলিখিত মৌখিক প্রকাশ। এতে শব্দ ব্যবহার করা হয় বটে, তবে এটা লিখিতভাবে ব্যবহার না করে কথার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত যোগাযোগের অধিকাংশই বাচনিক যোগাযোগ। এমনকি লিখিত দলিলগুলোও শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে বাচনিক শব্দের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মুখে মুখে কথার মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তাকে বাচনিক যোগাযোগ বলে।

⊙ লিখিত যোগাযোগ (Written communication): মুখে কথা না বলে কাগজে কলমে লিখে যে যোগাযোগ করা হয় তা লিখিত যোগাযোগ নামে পরিচিত। লিখিত যোগাযোগে শব্দের ব্যবহার আছে কিন্তু তার ব্যবহার বচনের মাধ্যমে না হয়ে হয় লেখার মাধ্যমে। তাই লিখিত যোগাযোগ মানেই হলো শব্দের প্রয়োগকে লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে যোগাযোগ সাধন।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ বাচনিক যোগাযোগের চেয়ে অনেক কম ব্যবহার হলেও তা কম গুরুত্ব বহন করে না। ব্যবসায়ে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতিটি প্রায়শঃ গ্রহণ করা হয়, তা লিখিত যোগাযোগ। লিখন সহজ কাজ নয়, এটা একটি কৌশল বা আর্ট। সুলিখনের জন্য সুশিক্ষণ দরকার, দক্ষতার প্রয়োজন। লিখন সাধারণ ব্যাপার হলেও সবাই লিখতে পারে না। লিখিত যোগাযোগ পরোক্ষ ও অব্যক্তিক, তাই এতে তৎক্ষণাৎ ফলাফল জানার সুযোগ থাকে না। কিন্তু তথাপি আমরা লিখে থাকি এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে লিখন পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। লিখিত যোগাযোগের বিষয়বস্তুর বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না বলে লিখনকে যোগাযোগের একটি উত্তম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

⊙ অমৌখিক যোগাযোগ (Non-verbal communication): মুখের কথা এবং লেখা ছাড়াও আমরা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা যোগাযোগ করতে পারি। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যখন মনের ভাব প্রকাশ করা হয় তখন তাকে অমৌখিক যোগাযোগ বলে। অমৌখিক যোগাযোগে কথা কিংবা লেখা থাকে না, থাকে শারীরিক ভঙ্গি অর্থাৎ শরীরের ভাষা। শরীরের ভাষা মনের ভাষার অলিখিত প্রকাশ। তাই অমৌখিক যোগাযোগকে অনেকে 'দেহ-ভাষা' (body language) নামে অভিহিত করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অমৌখিক যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগের চেয়ে অধিকতর কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। চেহারার ভাব পরিবর্তন, ভাব-ভঙ্গি, আকার ইঙ্গিত ইত্যাদি দ্বারা আমরা অন্যের কথার পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারি। ১৯৫০ দশকের প্রথম দিকে রে. এল. বার্ড হুইস্টেল শারীরিক গতিবিধি (body motion) ও এর অর্থ (meaning) সংক্রান্ত ক্ষেত্রে

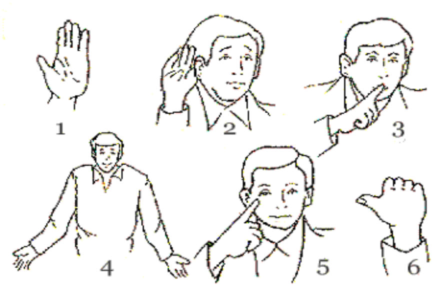

চিত্র ৭.২: হুইস্টেলের গবেষণাকৃত কাইনেসিকস।

চিত্র উৎস: Zahed Mannan, Business Communication: Strategies for Success in Business and Professions, University Grants Commission, Bangladesh, 2016

গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন। অমৌখিক যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক গতিবিধি ও আকার ইঙ্গিত (posture)-এর ওপর তাঁর গবেষণা ''কাইনেসিকস'' (Kinesics) নামে পরিচিত। তাঁর সে গবেষণার পর থেকে যোগাযোগের ওপর শারীরিক গতিবিধির প্রভাব সম্পর্কে যোগাযোগ বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

⊙ **ভিজুয়াল যোগাযোগ (Visual communication):** ভিজুয়াল যোগাযোগ একরকম অমৌখিক যোগাযোগ। এ ধরনের যোগাযোগ মানুষ স্বভাবসুলভ করে থাকে। যেমন- চেহারার ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, মুচকি হাসি ও ভ্রুকুটি ইত্যাদি। এ সবই ভিজুয়াল ও অমৌখিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম। এ ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা চিন্তাভাবনা করে এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করি না, স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করে। এ জন্য একে অমৌখিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত করা হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিকভাবে এর ব্যবহার না হলে অনেক বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ব্যবস্থাপনা

Management of interpersonal communication

একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ স্তরের প্রধান কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমিক-কর্মী পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি কর্মরত থাকে। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন বিভাগের সমস্ত কর্মীকে একযোগে কাজ করতে হয়। ফলে একজনের সঙ্গে অন্যজনের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সবাই আপন আপন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে বলে সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ে। তাই বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিক ঝর্ণাধারার মতই সতত প্রবাহমান থাকে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক যোগাযোগকে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বলা হয়। কারবার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজন ব্যবস্থাপককে বাহ্যিক সিস্টেমেও কাজ করতে হয়। যে কোনো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য গঠিত মানবীয় সংঘসমূহের অত্যাবশ্যকীয় অবস্থাকে বাহ্যিক সিস্টেম বলা হয়। অধিকাংশ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মানবীয় সংঘ (human organization) গঠন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে । এ চাপ কারিগরি, প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক ধরনের হতে পারে। কোনো মানব সম্পর্ককে তখনই বাহ্যিক সিস্টেম নামে অভিহিত করা হয় যখন এর প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট পরিবেশের কারিগরি, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানব সম্পর্কের উপকরণসমূহের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দ্বারা এর প্রকৃতি নির্ধারিত হয় না। এটা সংগঠনের অংশ গ্রহণকারীদের নিকট শুধু বাহ্যিকই নয়, এটা তাদের আচরণও সুনির্দিষ্ট করে দেয়। বাহ্যিক সিস্টেমে শুধুমাত্র ঐ ধরনের আচরণই অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন ও টিকে থাকার জন্য দরকার হয়, অন্য কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক সিস্টেম ''আনুষ্ঠানিক যোগাযোগেরই'' প্রতিবিম্ব।

সারসংক্ষেপ

মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বা তথ্য বিনিময় করে। ভাব বা তথ্যের এ বিনিময় কার্যকেই যোগাযোগ নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাদির আদানপ্রদান হলে তাকে ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়। উৎসস্থল থেকে এনকোডিং হয়ে বার্তায় রূপান্তরিত হওয়ার পর কোনো একটি মাধ্যমের সাহায্যে গ্রহীতার কাছে বার্তাটি ডিকোডিং হওয়ার যে গতিধারা তাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। যোগাযোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে- সমান্তরাল যোগাযোগ, লম্বিক যোগাযোগ, উর্ধ্বগামী যোগাযোগ, নিম্নগামী যোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, বাহ্যিক যোগাযোগ, আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ। প্রকাশের মাধ্যম অনুসারে যোগাযোগকে চার ভাগে ভাগ করা যায়: বাচনিক, লিখিত, অমৌখিক যোগাযোগ এবং চাক্ষুষ বা ভিজুয়াল যোগাযোগ।

পাঠ ৭.৩ নির্দেশনা ও নেতৃত্ব
Direction and Leadership

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ব্যবস্থাপনায় নির্দেশনা কী তা বলতে পারবেন।
- নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবেন
- নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরনের স্টাইলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারেবেন।

'নির্দেশনা' এবং 'ব্যবস্থাপক'- এ দুটি বিষয় একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনেকেই মনে করেন, নির্দেশনা নেতৃত্বের সাথে জড়িত। একজন নেতাও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন বটে কিন্তু তাঁর নির্দেশনার ধরণ এবং ব্যবস্থাপকের নির্দেশনার ধরণ এক নয়। ব্যবস্থাপক সাধারণত কর্মীদেরকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নেতৃত্ব, ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের স্টাইল জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে নির্দেশনা ও পরিচালনা কী। এ পাঠে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

নির্দেশনা কী
What is direction

ব্যবস্থাপনা জগতে ইংরেজি direction শব্দের অর্থ কেউ কেউ পরিচালনা, আবার কেউ কেউ নির্দেশনা বলে থাকেন। নির্দেশনা দান নেতৃত্বেরই একটি কাজ। সঠিক পরিচালনা বা নির্দেশনা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যার্জনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার, সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিচালনার অভাবে প্রতিষ্ঠান দিক হারা নৌকার মতো গন্তব্যহীন অবস্থায় চলতে চলতে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

ব্যবস্থাপক পরিকল্পিত কাজ শুরুর জন্য অধস্তন কর্মীদের যে আদেশ প্রদান করেন তাই পরিচালনা। পরিচালনা এবং নির্দেশ এক বিষয় নয়। পরিচালনা একটি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আর নির্দেশ পরিচালনার চূড়ান্ত ফল। নির্দেশের মাধ্যমে পরিচালনা প্রক্রিয়ার অবসান ঘটে। কর্মীদের কী কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে তাদের যে নির্দেশ জারি করা হয়, তাকেই পরিচালনা বলে। নির্দেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া পরিচালনা হিসেবে অভিহিত হলেও ব্যবস্থাপকদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ, প্রেষণাদান ইত্যাদিও পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, পরিচালনা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার একটি আন্তঃব্যক্তিক ধারণা যা দ্বারা অধস্তনগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান লাভ করে এবং ফলপ্রসূ ও সুনিপুণভাবে অবদান রাখতে পারে।[১]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তাকেই বলে পরিচালনা। আমরা নির্দেশনা কী তা জেনে নিলাম কারণ নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব- একে অপরের সাথে কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে জড়িত। আসুন নেতৃত্বের বিভিন্ন বিষয়াদিগুলো জেনে নেই।

---

[১] Weihrich, H. and Koontz, H. (2019). *Management: A global, innovative and entrepreneurial perspective*. McGraw Hill, India.

নেতৃত্ব কী

What is leadership

নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। একেকজন একেকভাবে নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া দুষ্কর। এ পর্যন্ত যতজন নেতৃত্বের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অন্তত ততোটি নেতৃত্বেও সংজ্ঞা পাওয়া যাবে। যাহোক, প্রায় সবাই একটি ব্যাপারে একমত যে, নেতৃত্বের বিষয়টি প্রভাব-প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্নতর কিছু কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে এখনো যথেষ্ট বিতর্ক চলছে- অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা আলাদা আলাদা বিষয়। নেতা ও ব্যবস্থাপকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক। প্রেষণা, ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং চিন্তা ও কর্মে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।[২]

মতদ্বৈততা থাকা সত্ত্বেও আমরা নেতৃত্বের একটি ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারি। আমরা সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি যে, নেতৃত্ব হলো বিশেষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো দলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। **জর্জ টেরি**- এর মতে, নেতৃত্ব হলো মানুষকে প্রভাবিত করার একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা দলীয় লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বেচ্ছায় উদ্যমী হয়। অর্থাৎ নেতৃত্ব হলো একটি প্রভাব-প্রক্রিয়া যা অন্যদের আচরণ পরিবর্তনে নিবেদিত হয়।[৩]

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি বা দলের কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো নেতৃত্ব। নেতৃত্ব হচ্ছে মানুষের আচরণিক গুণের সমষ্টি যা তাদেরকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য চালিত করে। মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃত্ব অগ্রভাগে থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করে। নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো মিল রয়েছে কি? আসুন খুঁজে দেখি।

নেতৃত্ব বনাম ব্যবস্থাপনা

Leadership versus management

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে মিল আছে, আবার কতিপয় ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে। উভয়ের মধ্যকার যে সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই তা হচ্ছে ব্যবস্থাপক না হয়েও কেউ নেতা হতে পারে; আবার কেউ নেতা না হয়েও ব্যবস্থাপক হতে পারে। বাস্তবে আমরা দেখি যে, সব নেতা ব্যবস্থাপক নন এবং সব ব্যবস্থাপক নেতা নন। প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর একজন ব্যবস্থাপক কতগুলো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এর দ্বারা এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি ফলপ্রসূভাবে প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালের বাইরে এসে লোকজনকে পরিচালিত করার ক্ষমতা থাকলে সেখানেই নেতৃত্বের বিকাশ হয় সর্বাধিক।

আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে পরিচালিত করতে পারেন, নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধুই ব্যবস্থাপক- নেতা নন। কিন্তু তিনি যদি অধীনস্থদের সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে কাজে উদ্যমী করে তুলতে পারেন, তখন তিনি তাদের নেতাও বটে। উদাহরণস্বরূপ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক যখন বিভাগের কর্মচারীদেরকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন এবং কর্মচারীরাও নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করে, তখন তিনি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন। যদি তিনি একজন কর্মচারীর ব্যক্তিগত সমস্যা (ধরুন, তার ছেলের গুরুতর অসুস্থ) সমাধানের জন্য বিভাগের সকল কর্মীকে একত্রিত করে মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তখন তিনি নেতা হিসেবে কাজ করছেন।

নেতৃত্ব ও ক্ষমতা

Leadership and power

নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ক্ষমতা হলো অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে আমরা ইউনিট ৬- এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দেখব ক্ষমতা কীভাবে নেতৃত্বের সাথে জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে পাঁচ প্রকারের ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। আসুন এ সম্পর্কে জেনে নেই।

---

[২] Zaleznik, A. (1977). *Managers and Leaders: Are They Different?* Inside the Mind of the Leader, January, 2004.

[৩] Fleet, D. (1995). *Contemporary management*. Houghton Mifflin College Div.

১. আইনানুগ ক্ষমতা (Legitimate power): সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক বা কর্মী আইনানুগ ক্ষমতা অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মীদেরকে প্রদত্ত এরূপ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান নিজেই সংজ্ঞায়িত করে দেয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে, শুধুমাত্র আইনানুগ ক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপক হওয়া যায় কিন্তু নেতা হওয়া যায় না। সব ব্যবস্থাপকেরই আইনানুগ ক্ষমতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই নেতা হতে পারে না। নেতা হওয়ার জন্য আরও কিছু গুণাবলি থাকা অপরিহার্য।

২. পুরষ্কৃত করার ক্ষমতা (Reward power): কর্মীদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতাকে পুরষ্কৃত করার ক্ষমতা বলা হয়। একজন ব্যবস্থাপক যেসব ''পুরষ্কার'' (rewards) নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেগুলো হলো বেতন বৃদ্ধি, বোনাস প্রদান, পদোন্নতি প্রদান, কাজের স্বীকৃতি ইত্যাদি। একজন ব্যবস্থাপক যত বেশি সংখ্যক 'পুরষ্কার' নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, এবং অধীনস্থদের নিকট পুরষ্কারের গুরুত্ব যত বেশি হবে, ব্যবস্থাপকের পুরষ্কার ক্ষমতাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থাপক নিজকে সীমিত রাখলে তিনি এক্ষেত্রে শুধুই ব্যবস্থাপক-নেতা নন। পক্ষান্তরে, অধীনস্থ কর্মীরা যদি ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ''অনানুষ্ঠানিক'' পুরষ্কার যথা প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, ভালো কাজের প্রকাশ্য স্বীকৃতি পান, তাহলে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপক নেতৃত্ব ব্যবহার করছেন।

৩. জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা (Coercive power): মনস্তাত্ত্বিক আবেগজড়িত বা শারীরিক ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অধীনস্থ কর্মীদের নির্দেশ মান্য করার জন্য বাধ্য করা হলে এরূপ ক্ষমতাকে জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা বলা হয়। আগেকার যুগে জবরদস্তিমূলক ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু কর্মচারীদের সাংগঠনিক একতা এবং শিক্ষার মান বাড়ার কারণে এখন এরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ, অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছে। জবরদস্তিমূলক ক্ষমতার প্রয়োগকারী ব্যবস্থাপকদেরকে কর্মীরা নেতা হিসেবে বিবেচনা করে না।

৪. মোহন ক্ষমতা (Referent power): অনুসারী কর্তৃক অনুকরণ, আনুগত্য প্রকাশ বা নেতার মোহনীয় গুণ (charisma) নেতার বা ব্যবস্থাপকের মোহন ক্ষমতার উৎস। একজন ব্যবস্থাপককে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে কর্মীরা অনুকরণ করলে বলা যায় যে, তিনি মোহন ক্ষমতার অধিকারী।

৫. বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা (Expert power): একজন ব্যবস্থাপকের কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষায়ণের কারণে বা বিশেষ জ্ঞান থাকার কারণে তিনি বিশেষজ্ঞ ক্ষমতার অধিকারী হন।

নেতৃত্বে ক্ষমতার ব্যবহার নির্ভর করে নেতৃত্বের স্টাইলের ওপর। কেউ কেউ একে নেতৃত্বের ধরনও বলে থাকেন। আসুন এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কারা যাক।

নেতৃত্বের স্টাইল
Leadership styles

নেতাকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এর ফলে তার আচার-আচরণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলত তিন প্রকারের নেতৃত্ব-স্টাইলের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়:

১. স্বেচ্ছাচারী স্টাইল
২. অংশগ্রহণমূলক স্টাইল
৩. অবাধ স্টাইল

১. স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব স্টাইল (Autocratic leadership style): যে নেতৃত্বে অনুসারীদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করা হয়, তা স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব নামে পরিচিত। স্বেচ্ছাচারী নেতারা:

ক. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন;
খ. কোনো কর্ম-বিষয়ক ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত গ্রহণ না করে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন;
গ. মনগড়াভাবে টার্গেট ঠিক করে তা অর্জনের জন্য কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন;
ঘ. প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না করলে কর্মীদেরকে শাস্তির ভয় দেখান কিংবা চাকরিচ্যুত করেন বা অন্য প্রকারের শাস্তি দেন;
ঙ. অধীনস্থদের নিকট সাধারণত কর্তৃত্ব অর্পণ করেন না।

তবে বাস্তবে দেখা যায়, কিছু কিছু 'দয়াবান স্বেচ্ছাচারী নেতা' (benevolent autocrat) থাকেন যারা কর্মীদেরকে কতিপয় ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করেন। এরূপ নেতৃত্বের ভালো দিক হলো: দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়; নেতা নিজের মনে তৃপ্ত থাকেন বলে মনোযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন; কম দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী ব্যবহার করা সম্ভব হয়, কারণ নেতা জটিল কাজগুলো নিজেই সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। আর মন্দ দিক হলো: কর্মচারীরা সাধারণত এরূপ নেতৃত্ব পছন্দ করে না; কর্মীদের মধ্যে ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়; নেতা বা ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রলুব্ধ হতে পারেন এবং দুর্নীতির বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২. অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব স্টাইল (Participative leadership style): অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হলো কর্মীদেরকে সব রকমের কর্ম-বিষয়ক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান। অংশগ্রহণমূলক নেতারা:

ক. ক্ষমতা/কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করেন।
খ. আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
গ. যে-কোন বিষয়ে কর্মীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করেন।
ঘ. এমনভাবে আচরণ করেন মনে হয় যেন তারা সকলেরই একজন।
ঙ. কর্মীদেরকে তাদের কাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়মিত অবহিত করেন।
চ. কর্মীদেরকে নতুন নতুন আইডিয়া ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন এবং ভালো আইডিয়ার জন্য পুরস্কৃত করেন।

এরূপ নেতৃত্বের সুবিধা হলো: কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে; সবাই মিলেমিশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে, ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা কমে যায়; নেতা বা ব্যবস্থাপক অধিকাংশ ক্ষমতা অধীনস্থদের ওপর অর্পণ করে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিজকে নিয়োজিত রাখতে পারেন- মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারেন; এবং সর্বোপরি, কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে প্রতিষ্ঠানকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারেন। আর, এরূপ নেতৃত্বের অসুবিধা হলো: সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব কিছু করা হয় বলে সময় নষ্ট হয়; কর্মীদের যথাযথ যোগ্যতা না থাকলে তারা অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে ব্যর্থ হয়।

৩. অবাধ নেতৃত্ব স্টাইল (Laissez-faire or free leadership style): অবাধ নেতৃত্ব এমন এক ধরনের নেতৃত্ব যেখানে নেতা বা ব্যবস্থাপক নিজের হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা রাখেন না এবং কর্মীদেরকে স্ব স্ব কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। অবাধ নেতারা:

ক. ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পরিহার করে চলে।
খ. কর্মীদলকে নিজ নিজ লক্ষ্য স্থির করা এবং নিজের সমস্যা নিজেদেরকে সামাল দেওয়ার পরামর্শ দেন।
গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করেন।

এরূপ নেতৃত্ব শুধুমাত্র যেসব প্রতিষ্ঠানে খুবই দক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মী রয়েছে সেখানে উপযোগী। কর্মীদলের যোগ্যতার ওপর অবাধ নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভরশীল। গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বা বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে এরূপ নেতৃত্ব সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি বা দলের কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো নেতৃত্ব। আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে পরিচালিত করতে পারেন, নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধুই ব্যবস্থাপক- নেতা নন। কিন্তু তিনি যদি অধীনস্থদের সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে কাজে উদ্যমী করে তুলতে পারেন, তখন তিনি তাদের নেতাও বটে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে নেতৃত্বে পাঁচ প্রকারের ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়: আইনানুগ ক্ষমতা, পুরস্কৃত করার ক্ষমতা, জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা, মোহন ক্ষমতা এবং বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলত তিন প্রকারের নেতৃত্ব-স্টাইলের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়: স্বেচ্ছাচারী স্টাইল, অংশগ্রহণমূলক স্টাইল এবং অবাধ স্টাইল।

পাঠ ৭.৪ নেতৃত্ব তত্ত্ব
Leadership Theories

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- লক্ষণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আচরণ তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিস্থিতিগত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষের নেতৃত্বদানের বাসনা তখন থেকে শুরু যখন থেকে তারা দলীয়ভাবে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করা শুরু করেছিল। তখন থেকেই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কয়েকটি তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সবই গবেষণার ফসল। সময় ও অবস্থার বিবেচনায় এখনো এসব তত্ত্বগুলো ব্যবস্থাপকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এখনো নেতৃত্বের ওপর বহু বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও সংগঠনের কাঠামোর ওপর নেতৃত্ব তত্ত্বের চর্চা অনেকখানি নির্ভরশীল তথাপি একথা অনস্বীকার্য, নেতা ও কর্মীর আচরণের দ্বারাও নেতৃত্ব প্রভাবিত হয়। তিন ধরনের প্রেক্ষাপটে লক্ষণ তত্ত্ব, আচরণ তত্ত্ব এবং পরিস্থিতিগত তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এ পাঠে আমরা এ তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা পরবর্তী পাঠে আলোচনা করব।

লক্ষণ তত্ত্ব
Trait theory

নেতৃত্ব কী তা বোঝার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী ও অন্যান্য গবেষকরা নেতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলি শনাক্তকরণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা খোঁজে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, একজন নেতা কার্যকর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহার কীরূপ হয়, কী দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কী? এ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, একজন নেতা জন্মগতভাবেই কতিপয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) এ তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ। ক্ষমতায় উন্নীত ব্যক্তির প্রতিভা, দক্ষতা এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য তিনি এ তত্ত্বটি ব্যবহার করেছেন। রোনাল্ড হেইফেজ লক্ষণ তত্ত্বের মধ্যে উনিশ শতকের ছায়া খোঁজে পেয়েছেন, যখন মহান ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে সমাজের ইতিহাসকেও যুক্ত করা হতো। কেউ কেউ এ তত্ত্বকে ‘বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব’ এবং ‘গুণভিত্তিক তত্ত্ব’ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

নেতৃত্বের ওপর প্রাথমিক গবেষণাকারীরা মনে করতেন, নেতার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে তা তাকে নেতা হিসেবে গড়ে ওঠতে সাহায্য করে। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে থাকে। লক্ষণ তত্ত্বের প্রবক্তারা সাধারণত নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলিকে তালিকাবদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা ধরে নেন, কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই কার্যকর নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। শেলি কার্কপ্যাট্রিক এবং এডুইন এ. লক লক্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন: ‘‘নেতৃত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো চালনাশক্তি (ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ যার অন্তর্ভুক্ত হলো কৃতিত্ব, প্রেরণা, উচ্চাশা, প্রাণশক্তি, উদ্যোগ, এবং লেগে থাকার ক্ষমতা), নেতৃত্বের প্রেরণা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মবিশ্বাস, অনুধাবনের ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান।’’

আচরণ তত্ত্ব
Behavioral theories

এ তত্ত্বের অনুসারীরা মনে করেন, সফল নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার চাহিদা বেশি থাকবে, সংযোগের চাহিদা কম থাকবে, এবং উচ্চ মাত্রায় সক্রিয়ভাবে বাধাদানের ক্ষমতা থাকবে। একে আত্ম-নিয়ন্ত্রণও বলা যায়। সার্থক নেতারা বিভিন্ন

পরিস্থিতিতে সমজাতীয় আচরণ করে থাকেন। এ তত্ত্বে আরও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, নেতৃত্ব শুধুমাত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়না বরং নেতাদের নির্দিষ্ট আচরণ অন্যদের প্রভাবিত করে। এ তত্ত্বের অনুসারীদের পরিচালিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষার ফলাফল হচ্ছে-

১. মিশিগান সমীক্ষা (The Michigan Studies)
২. ওহিও স্টেট সমীক্ষা (The Ohio State Studies)
৩. ব্যবস্থাপকীয় গ্রিড মডেল (Managerial Grid Model)

আসুন, এ সমীক্ষাগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই।

১. মিশিগান সমীক্ষা (The Michigan Studies)

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এ সমীক্ষার নেতৃত্ব দেন রেনসিস লাইকার্ট (Rensis Likert)। এ সমীক্ষার অধীনে বিভিন্ন সংগঠনে ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজরদের আচরণ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। সমীক্ষাটির উদ্দেশ্য ছিল সফল নেতাদের আচরণ ও অসফল নেতাদের আচরণের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা। একজন সফল ও অসফল বা ব্যর্থ নেতার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা, কার্য সন্তুষ্টি, কর্মীদের অনুপস্থিতি ও ঘূর্ণায়মানতা, অপচয় ও ব্যয় ইত্যাদি বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

সমীক্ষায় দুটি মৌলিক ধরনের নেতৃত্ব-আচরণ চিহ্নিত করা হয়-

ক) কার্যনির্ভর নেতৃত্ব-আচরণ এবং
খ) কর্মীনির্ভর নেতৃত্ব-আচরণ

সমীক্ষকরা দেখলেন যে, কার্যনির্ভর নেতারা অধস্তন কর্মীদের কাজের ওপর গভীর মনোযোগ দেন, কাজের পদ্ধতি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, কাজের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেন এবং কার্যফল নিয়েই বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন।
চিত্র ৭.৩ লক্ষ করুন:

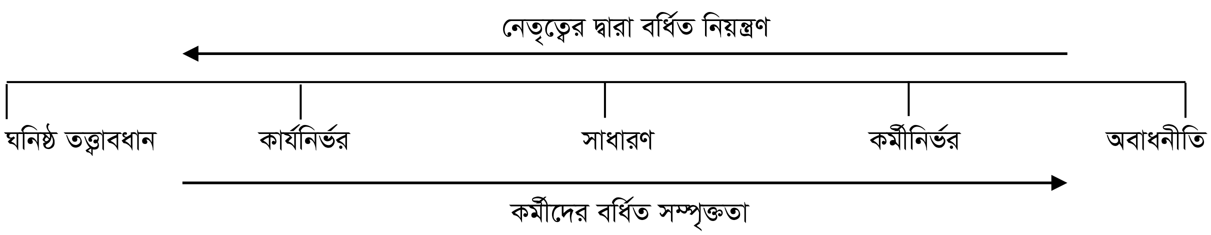

চিত্র ৭.৩: নেতৃত্বে আচরণের ধারবাহিকতা

পক্ষান্তরে, কর্মী নির্ভর নেতারা একটি ঘনিষ্ঠ কর্মীদল গড়ে তুলতে এবং প্রতিটি কর্মী যাতে তার কাজে সন্তুষ্ট থাকে সে ব্যাপারে বেশি আগ্রহী থাকে। এ ধরনের নেতার মূল চিন্তাই হলো অধীনস্থ কর্মীদের মঙ্গল। নেতৃত্বের এ দুটি স্টাইল দুদিকে অবস্থিত বলে মনে করা হয় এবং একজন নেতা যে কোনো একটি স্টাইল অনুসরণ করতে পারেন বলে সমীক্ষকরা মনে করতেন।

২. ওহিও স্টেট সমীক্ষা (The Ohio State Studies)

চল্লিশ শতকের শেষ দিকে এবং পঞ্চাশ দশকের শুরুতে ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। সমীক্ষকরা তাদের উদ্ভাবিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সেনাবাহিনী এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপকদের আচরণ সম্পর্কে তাদের অধীনস্থদের কাছ থেকে ধারণা গ্রহণ করেন। মিশিগান সমীক্ষার মতই এ সমীক্ষায়ও নেতার আচরণের দুটি উপাদান চিহ্নিত করা হয়:

ক) বিবেচনা (Consideration)
খ) উদ্যোগী কাঠামো (Initiating Structure)

বিবেচনামূলক আচরণ হলো, নেতা যখন অধস্তনদের অনুভূতি নিয়ে চিন্তা করেন এবং তাদের মতামতকে সম্মান করেন। নেতা ও অধস্তনদের মধ্যকার সম্পর্ক যখন পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ এবং উভয়মাত্রিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নেতা বিবেচনা প্রসূত নেতৃত্বের ধারা অনুসরণ করছেন বলা যায়।

উদ্যোগী কাঠামো বলতে, নেতা কর্তৃক দলের কাঠামো গঠন এবং এর কার্যক্রমের সূচনাকে বোঝানো হয়। যখন নেতা অধস্তনদের কাজ ও ভূমিকা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন এবং কর্মীরা স্পষ্ট করে জানেন যে সংগঠনে তাদের কী কাজ করতে হবে, তখনই নেতা কাঠামো গঠনে উদ্যোগ প্রসূত আচরণ অনুসরণ করছেন বলা যায়। এ ধরনের নেতা অধস্তনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং দলের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। চিত্র ৭.৪- এর মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যায়:

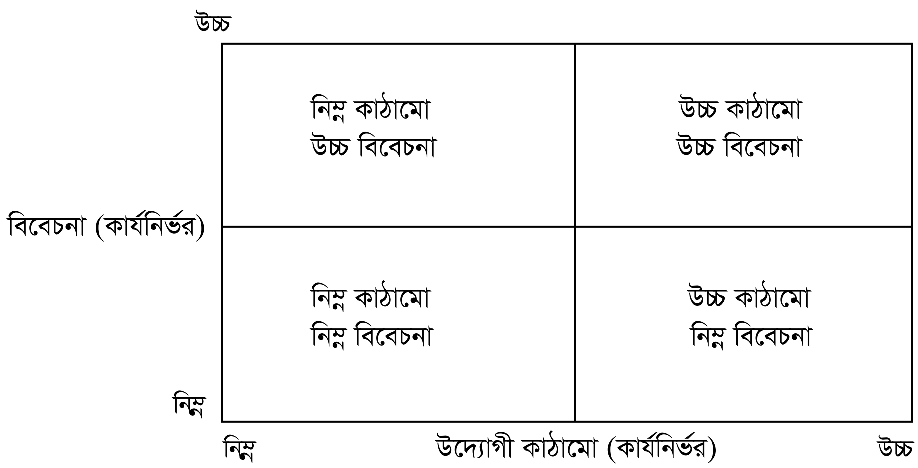

চিত্র ৭.৪: নেতৃত্বে ওহিও স্টেট সমীক্ষা

উদ্যোগী কাঠামো পরিচালিত নেতার আচরণ হলো কার্য-নির্ভর। কাজের খবরদারি, উৎপাদন এবং কর্তব্য ও দায়িত্বের ওপর তারা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সমীক্ষায় সমীক্ষকরা এ দুটি নেতৃত্বের ধারাকে দুটি পৃথক মাত্রায় অবস্থিত বলে মনে করেন। অর্থাৎ, একজন নেতা একই সঙ্গে উচ্চ বিবেচনা প্রসূত ও নিম্ন-কাঠামো গঠনে উদ্যোগ প্রসূত আচরণ করতে পারেন অথবা উচ্চ উদ্যোগী কাঠামো গঠন ও নিম্ন বিবেচনা প্রসূত আচরণ করতে পারেন।

৩. ব্যবস্থাপকীয় গ্রিড মডেল (Managerial Grid Model)

রবার্ট ব্লেক এবং জেন মউটন (Robert Blake and Jane Mouton) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবস্থাপকীয় গ্রিড মডেল উদ্ভাবন করেন, যার দ্বারা পাঁচ ধরনের নেতৃত্বের স্টাইল উন্মোচিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপকের আচরণ দুটি মাত্রায় বিভক্ত। একটি হলো উৎপাদনের জন্য উদ্বিগ্নতা এবং অপরটি হলো কর্মীর জন্য উদ্বিগ্নতা। উৎপাদনের জন্য উদ্বিগ্নতা কার্য-নির্ভর বা কাঠামো গঠনে উদ্যোগী নেতার আচরণের মতো। পক্ষান্তরে, কর্মীর জন্য উদ্বিগ্নতা হলো কর্মী নির্ভর বা বিবেচনা প্রসূত নেতার আচরণের মতো। চিত্র ৭.৫ লক্ষ করুন:

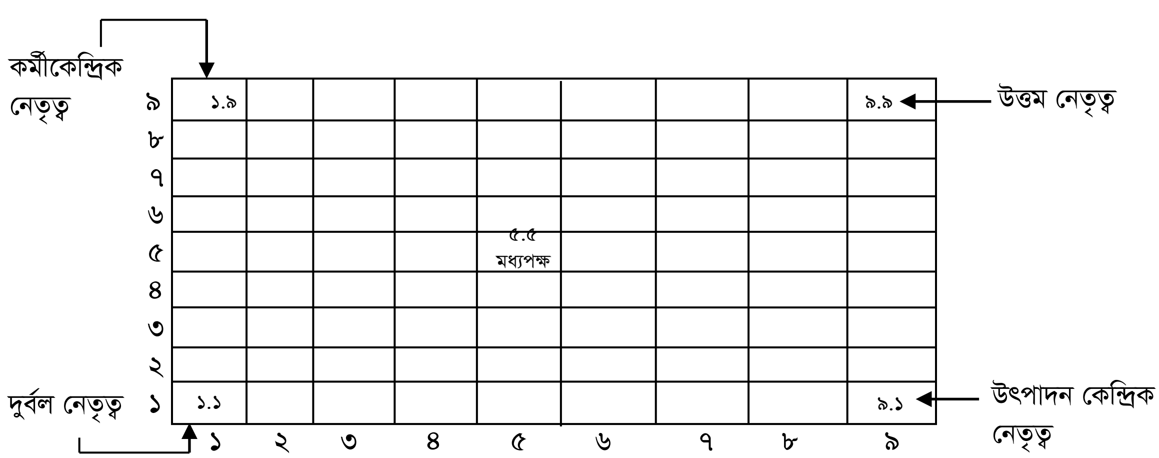

চিত্র ৭.৫: ব্যবস্থাপকীয় গ্রীড মডেল

১.১ দুর্বল নেতৃত্ব: এ পরিস্থিতিতে নেতা বা ব্যবস্থাপকের ন্যূনতম প্রচেষ্টায় সংগঠন চলতে পারে। এক্ষেত্রে উৎপাদন বা কর্মী কোনোটার জন্যই নেতা উদ্বিগ্ন নন। অধস্তনরা যখন অতি মাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা প্রিয় হয় এবং নিজ ইচ্ছে মত আচরণ করে তখন এ ধরনের নেতৃত্বের আচরণ বিরাজ করে।

৯.১ উৎপাদন কেন্দ্রিক নেতৃত্ব: এ পরিস্থিতিতে নেতার উৎপাদনের প্রতি সর্বোচ্চ উদ্বিগ্নতা প্রয়োজন, কর্মীর প্রতি নয়। কাজেই উৎপাদন দক্ষতার জন্য মানব সম্পর্ক যাতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেটা দেখা নেতার কাজ।

১.৯ কর্মী কেন্দ্রিক নেতৃত্ব: পূর্বে নেতৃত্বের এ স্টাইলটি 'কান্ট্রি ক্লাব' নামে পরিচিত ছিল। এ অবস্থায় নেতাকে উৎপাদনের পরিবর্তে সংগঠনের সদস্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিনোদন ও কল্যাণের ওপর বেশি মনোযোগ দিতে হয়।

৫.৫ মধ্যপথ: এক্ষেত্রে নেতা সংগঠনের উৎপাদন ও কর্মীদের জন্য সমান মাত্রায় উদ্বিগ্নতা দেখান। এ স্টাইলে বিশ্বাস করা হয়, সংগঠনে উৎপাদন ও কর্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য একটি সন্তোষজনক মাত্রায় রাখলেই সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল বলে বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে নেতা উৎপাদন ও কর্মীর জন্য সমান মাত্রায় একটি মাঝামাঝি অবস্থানে উদ্বিগ্নতা বোধ করলেই সংগঠনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন।

৯.৯ **উত্তম নেতৃত্ব:** এ নেতৃত্বের স্টাইলকে টিম ওয়ার্কও বলা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ও কর্মীর জন্য নেতার সর্বোচ্চ উদ্বিগ্নতা। কাজের জন্য নেতাকে উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি কর্মীর সুযোগ সুবিধার প্রতিও নেতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এর দ্বারা গড়ে ওঠবে টিম ওয়ার্ক, যা কাজের প্রতি কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টা। ব্লেক ও মউটনের মতে, সবচেয়ে সফল নেতৃত্বের ধারা হলো টিম ওয়ার্ক, অর্থাৎ যে নেতা উৎপাদন ও কর্মীর জন্য যুগপৎভাবে সর্বোচ্চভাবে উদ্বিগ্ন থাকবেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যাবেন, সংগঠনে তিনিই হবেন সফল নেতা।

পরিস্থিতিগত তত্ত্ব

Contingency theory

ব্যবসায় জগত এমন অনেক নেতাদের গল্প আছে যারা মহত্ব অর্জন করতে পারেনি, কারণ তারা তাদের কর্ম পরিমণ্ডল ও পরিস্থিতি বিশদভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ তত্ত্বের উদ্ভাবকরা হলেন সেসব ব্যবস্থাপক, কলসাল্ট্যান্ট ও গবেষক যাঁরা প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব তত্ত্বকে বাস্তব জগতে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, কোনো পদ্ধতি একটি ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে অথচ অন্য ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দেখলেন, ফলাফল ভিন্ন রকমের হয় কারণ পরিস্থিতিও ভিন্ন। এক পরিস্থিতিতে যে কৌশল সফল হবে, অন্যান্য পরিস্থিতিতে সেটি সমভাবে সফল নাও হতে পারে। এখানে আমরা প্রধান দুটি পরিস্থিতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব: ফিডলার মডেল এবং লক্ষ্য-পথ তত্ত্ব। এ দুটি তত্ত্বই নেতৃত্বের স্টাইল ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, একই সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্বের ধরন কী হবে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ফিডলার মডেল (Fiedler model): ১৯৬৭ সালে ফ্রেড ফিডলার (Fred Fiedler) দীর্ঘ ১৬ বছরের সমীক্ষা শেষে পরিস্থিতিগত তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একজন নেতার সফলতা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। কোনো একজন নেতা বিশেষ পরিস্থিতিতে সফল হবেন আবার ভিন্ন পরিস্থিতিতে সফল নাও হতে পারেন। একজন নেতার কাজ হলো বিশেষ ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে, বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ সময়ে কোন কৌশল বা পদ্ধতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হবে তা খোঁজে বের করা। পরিস্থিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যসিদ্ধির জন্য সবচেয়ে উত্তম- এ বিষয়টি মাথায় রেখে একজন নেতা কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। কী ধরনের নেতা কী পরিবেশে সফল হবেন এ তত্ত্ব তাও ব্যাখ্যা করেছে, অর্থাৎ শুধুমাত্র নেতার গুণাবলিই নয়, পরিবেশও নেতার নেতৃত্বের সফলতার জন্য কাজ করে।

আসুন, এবার এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. **নেতার ব্যক্তিত্ব:** ফিডলার এবং তার সহযোগীরা মনে করেন যে, নেতার সাফল্য নির্ভর করে নেতার ব্যক্তিত্ব এবং পরিস্থিতির সামঞ্জস্যের মধ্যে। নেতার ব্যক্তিত্বকে তাঁরা দুভাগে ভাগ করেছেন- কর্মমুখী ও সম্পর্কমুখী। এছাড়াও পরিস্থিতির অবস্থাভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন- সবচাইতে উপযোগী, অনুপোযোগী এবং মাঝামাঝি।

২. **কর্ম ও সম্পর্কমুখী প্রেষণা:** আচরণ তত্ত্বে যেভাবে কার্যভিত্তিক ও কর্মীভিত্তিক বা কাঠামো গঠন উদ্যোগ ও বিবেচনাপ্রসূত আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঠিক তেমনি এ তত্ত্বেও কর্ম ও সম্পর্কমুখী প্রেষণারও একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে, এ তত্ত্বে ফিডলার এ দুটিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখিয়েছেন এবং ব্যক্তি বিশেষে এ বৈশিষ্ট্যর কোনো পরিবর্তন হয়না। নেতার কর্ম ও সম্পর্কমুখী প্রেষণা পরিমাপের জন্য ফিডলার সবচেয়ে কম পছন্দের সহকর্মী স্কেল (Learnt Preferred Co-Worker Scale) উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিতে, নেতাকে তার কর্মজগতে যাদের সঙ্গে কাজ করছেন তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কমপছন্দের সহকর্মীকে চিহ্নিত করতে বলা হয় এবং সেই সহকর্মীকে ১৬ টি বিষয়ে ৮ মাত্রার স্কেলে পরিমাপ করতে বলা হয়। যেমন-

অপটু ———————————————— পটু

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

বন্ধুসুলভ ———————————————— অবন্ধুসুলভ

৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

অর্থাৎ, সংখ্যা যত বেশি হবে তত গুণগত বিচারে তা হবে কম পছন্দের সহকর্মীর ধনাত্মক (Positive) মূল্যায়ন। সংখ্যা যত কম হবে তত তা হবে সবচাইতে কম পছন্দের সহকর্মীর ঋণাত্মক (Negative) মূল্যায়ন।

৩. **পরিস্থিতির উপযোগিতা:** ফিডলারের মতে, পরিস্থিতির উপযোগিতা নির্ভর করে তিনটি উপাদানের ওপর।

ক) নেতা ও দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক

খ) কাজের কাঠামো

গ) পদগত ক্ষমতা

নেতার জন্য সবচেয়ে উপযোগী পরিস্থিতি হলো যখন নেতা ও দলের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক খুব ভালো থাকে। যখন যে কাজটি দল করবে তা যদি খুবই কাঠামোগত হয় তাহলে নেতার পদগত ক্ষমতাও বেশি থাকে। নেতার জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী পরিস্থিতি হলো যখন নেতার সাথে দলের সদস্যদের সম্পর্ক খারাপ থাকে। অর্থাৎ, যখন যে কাজটি দল করবে তা যদি হয় কাঠামোগতভাবে দুর্বল এবং নেতার পদগত ক্ষমতা যদি হয় খুবই কম। এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান হলো নেতার জন্য একটি উপযোগী ও অনুপযোগীর একটি মাঝামাঝি পর্যায়। ফিডলারের মতে, পরিস্থিতি যখন অনেক উপযোগী বা অনুপযোগী তখন কর্মমুখী নেতৃত্ব সফল হবে। আর পরিস্থিতি যখন এ দুয়ের মাঝামাঝি পর্যায় তখন সম্পর্কমুখী নেতৃত্ব সফল হবে। চিত্র ৭.৬ লক্ষ করুন-

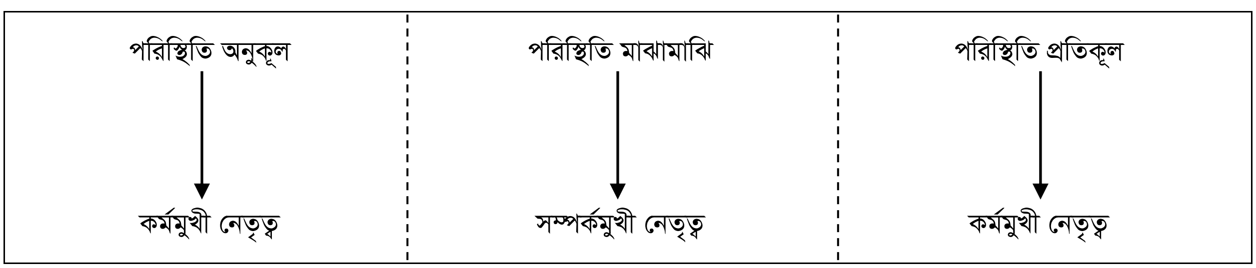

চিত্র ৭.৬: ফিডলারের পরিস্থিতিগত মডেল

ফিডলারের পরিস্থিতিগত তত্ত্বের পাশাপাশি সত্তরের দশকে আধুনিক নেতৃত্বের ওপরে মার্টিন ইভানস এবং রবার্ট হাউস (Martin Evans and Robert House)-এর আরেকটি গবেষণালব্ধ ফলাফল হচ্ছে লক্ষ্য-পথ তত্ত্ব। আসুন, এ তত্ত্বটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিই।

লক্ষ্য-পথ তত্ত্ব

Path-goal theory

বর্তমানে নেতৃত্বে বহুল আলোচিত তত্ত্বটি হচ্ছে লক্ষ্য-পথ তত্ত্ব। এটিও একটি পরিস্থিতিগত তত্ত্ব। তবে এ তত্ত্বে নেতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের চাইতে পরিস্থিতি ও নেতার আচরণের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অধস্তনদের কর্মসন্তুষ্টি, প্রেষণা ও কর্মসম্পাদন দ্বারা নেতা প্রভাবিত হয়। এ তত্ত্বটি নেতৃত্বের আচরণের চারটি স্বতন্ত্র ধরন সনাক্ত করেন। চিত্র ৭.৭- এ চারটি ধরন দেখানো হলো:

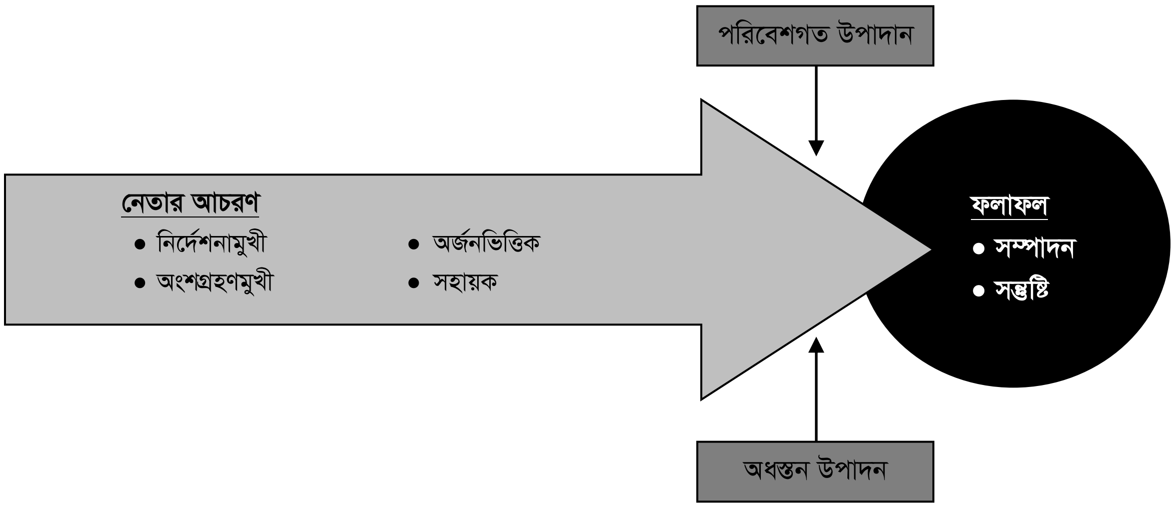

চিত্র ৭.৭: লক্ষ্য-পথ তত্ত্ব

(ক) নির্দেশনামুখী নেতৃত্ব (Directive leadership): এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে তা জানিয়ে দেন, কাজের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং কী করে নির্ধারিত মানের কাজ সম্পাদন করা যায় তা বলে দেন।

(খ) অংশগ্রহণমুখী নেতৃত্ব (Participative leadership): এ ধরনের নেতৃত্বের স্টাইলে নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধস্তনদের অংশগ্রহণে বিশ্বাসী থাকেন। যখনই নেতা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তখনই অধস্তনদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাদের সুপারিশ বিশ্লেষণপূর্বক তা বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

(গ) অর্জনভিত্তিক নেতৃত্ব (Achievement oriented leadership): এ ক্ষেত্রে নেতারা অধস্তনদের জন্য জটিল এবং দুঃসাহসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সবচেয়ে উঁচুমানের কাজ সম্পাদন করবেন বলে আশা করেন এবং অধস্তনরা সর্বোত্তম উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জন করবেই- এক্ষেত্রে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। উদ্দেশ্য অর্জনই এ নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য।

(ঘ) সহায়ক নেতৃত্ব (Supportive leadership): নেতৃত্বের এ স্টাইলে নেতার সাথে অধস্তনদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। অধস্তনদের চাওয়াপাওয়া, সম্মান, মর্যাদা এবং কল্যাণের জন্য নেতা সদা সচেষ্ট থাকেন।

নেতৃত্ব তত্ত্ব জানার পাশাপাশি আমাদের নেতৃত্বের সমকালীন প্রেক্ষাপটটিও জানা দরকার। এ সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.৫ সমকালীন প্রেক্ষাপট
Contemporary Perspectives

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- মোহনীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রূপান্তরী নেতৃত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সময়ের বিবর্তনে ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও ধরনের পরিবর্তনের কারণে নেতৃত্বের ধরনেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমকালীন সময়ে মোহনীয় নেতৃত্বের (Charismatic Leadership) ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও রূপান্তরী নেতৃত্বের বিকাশ ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। আসুন, এ দুটি তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে নেই।

মোহনীয় নেতৃত্ব
Charismatic leadership

নেতৃত্বে মোহনীয় তত্ত্বটি আরোপিত তত্ত্বের সংযোজিত অংশ। ক্যারিসমা বা মোহময়তা একজন নেতার ব্যক্তিত্বের একটি অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য যা অন্যের মধ্যে আনুগত্য ও অনুকরণপ্রিয়তার জন্ম দেয়। মোহময়তা এক প্রকারের আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ যা সমর্থন ও গ্রহণকে অনুপ্রাণিত করে।

কোনো নেতার মধ্যে মোহময়তা থাকলে অনুসারীরা বা কর্মীরা তার বিশ্বাসকে আস্থার সাথে গ্রহণ করে, নেতার জন্য মমত্ব অনুভব করে, তার আদেশ-নির্দেশ-অনুরোধ বিনাবাক্যে মান্য করে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্রতের (mission) সাথে আবেগজড়িত একাত্মতা প্রকাশ করে। রবার্ট হাউজ (Robert House) প্রথমে ১৯৭৭ সালে মোহনীয় নেতৃত্বের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। Hunt and Larson সম্পাদিত Leadership: The Cutting Edge নামক গ্রন্থে তাঁর নিবন্ধ ''A 1976 Theory of Charismatic Leadership" প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর তত্ত্বে বলেন যে, মোহনীয় নেতার প্রচুর আত্মবিশ্বাস থাকে, তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শে দৃঢ়তা থাকে এবং তাঁরা অন্যদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রচণ্ড বাসনা পোষণ করেন। এছাড়াও, তাঁরা অনুসারীদের ওপর আস্থা রাখেন এবং তা প্রকাশও করেন।

রূপান্তরী নেতৃত্ব
Transformational leadership

রূপান্তরী নেতৃত্বও মোহনীয় নেতৃত্বের আরেকটি রূপ। রূপান্তরী নেতৃত্বকে আজকাল অনেকে 'উদ্দীপনামূলক নেতৃত্ব (Inspirational Leadership), উদ্যোগমূলক (Entrepreneurial) নেতৃত্ব, প্রতীকী (Symbolic) নেতৃত্ব' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকে। রূপান্তরী নেতৃত্বের নেতা বা ব্যবস্থাপক উদ্ভাবন ও ভিশনের নিরীখে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

Labich নামক একজন নিবন্ধকার সফল নেতৃত্বের জন্য সাতটি কার্য-কারণ সনাক্ত করেছিলেন: অধীনস্থদের বিশ্বাস করা, প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিশন নিরূপণকরণ, স্থির-মস্তিষ্কে দায়িত্ব সম্পাদন, ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহিতকরণ, বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন, দ্বিমত উৎসাহিতকরণ এবং কাজ সরলীকরণ। রূপান্তরী নেতৃত্বের সাথে এগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

<u>একজন রূপান্তরী নেতা:</u>

ক. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

খ. উক্ত পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন।

গ. সঠিক কৌশলগত ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন।

ঙ. পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বানুমান করেন এবং প্রতিযোগীদের আগেই নিজের প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পরিবর্তন আনয়ন করেন।

সারসংক্ষেপ

সময়ের বিবর্তনে ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও ধরনের পরিবর্তনের কারণে নেতৃত্বের ধরনেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমকালীন সময়ে মোহনীয় নেতৃত্বের ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ক্যারিসমা বা মোহময়তা একজন নেতার ব্যক্তিত্বের একটি অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য যা অন্যের মধ্যে আনুগত্য ও অনুকরণপ্রিয়তার জন্ম দেয়। মোহময়তা এক প্রকারের আন্তঃব্যক্তিক আকর্ষণ যা সমর্থন ও গ্রহণকে অনুপ্রাণিত করে। মোহনীয় নেতার প্রচুর আত্মবিশ্বাস থাকে, তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শে দৃঢ়তা থাকে এবং তাঁরা অন্যদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রচণ্ড বাসনা পোষণ করেন। এছাড়াও, তাঁরা অনুসারীদের ওপর আস্থা রাখেন এবং তা প্রকাশও করেন। রূপান্তরী নেতৃত্বও মোহনীয় নেতৃত্বের আরেকটি রূপ। রূপান্তরী নেতৃত্বের নেতা/ব্যবস্থাপক উদ্ভাবন ও ভিশনের নিরীখে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্বের পাঠে আমরা লক্ষণ ও আচরণ তত্ত্ব থেকে জেনেছি, নেতার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে তা তাকে নেতা হিসেবে গড়ে ওঠতে সাহায্য করে। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে থাকে। লক্ষণ তত্ত্বের প্রবক্তারা সাধারণত নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলিকে তালিকাবদ্ধ করে রাখেন। অন্যদিকে, আচরণ তত্ত্বের অনুসারীরা মনে করেন, সফল নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার চাহিদা বেশি থাকবে, সংযোগের চাহিদা কম থাকবে এবং উচ্চ মাত্রায় সক্রিয়ভাবে বাধাদানের ক্ষমতা থাকবে। সার্থক নেতারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমজাতীয় আচরণ করে থাকেন। এ তত্ত্বের অনুসারীদের পরিচালিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষার ফলাফল হচ্ছে- মিশিগান সমীক্ষা, ওহিও স্টেট সমীক্ষা এবং ব্যবস্থাপকীয় গ্রিড মডেল। এছাড়াও আমরা জেনেছি পরিস্থিতিগত তত্ত্ব সম্পর্কে। এ তত্ত্বের উদ্ভাবকরা দেখলেন, কোনো পদ্ধতি একটি ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে অথচ অন্য ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দেখলেন, ফলাফল ভিন্ন রকমের হয় কারণ পরিস্থিতিও ভিন্ন। এক পরিস্থিতিতে যে কৌশল সফল হবে, অন্যান্য পরিস্থিতিতে সেটি সমভাবে সফল নাও হতে পারে।

পাঠ ৭.৬ প্রেষণা
Motivation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- প্রেষণার কী তা বলতে পারবেন।
- প্রেষণার আদি তত্ত্বগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রেষণার সমসাময়িক তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "প্রেষণা" উপস্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্বের ওপর আমাদের আলোচনাটি শেষ করবো। একজন কর্মীর কর্মসম্পাদন তিনটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়: কর্মীর সামর্থ্য, কার্য-পরিবেশ এবং প্রেষণা। সামর্থ্য হলো কর্মীর কাজ করার শক্তি; কার্য পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হলো যন্ত্রপাতি, মালমসলা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য; এবং প্রেষণা হলো কাজ করার ইচ্ছ। যদি কোনো কর্মীর কাজ করার সামর্থ্যের ঘাটতি থাকে, ব্যবস্থাপক তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। যদি কার্য-পরিবেশে সমস্যা থাকে, তিনি পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে পরিবেশ উন্নত করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ব্যবস্থাপকের জন্য তা হবে চ্যালেঞ্জিং। এ পাঠে আমরা প্রেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রেষণা কী
What is motivation

কেন কিছু মানুষ খুব উৎসাহের সাথে কাজ করে, এমনকি প্রয়োজনের চাইতে অধিক? কেন কিছু মানুষ কাজের প্রতি অনীহা বোধ করে, শুধুমাত্র ততোটুকুই করে যতটুকু না করলেই নয়? কীভাবে দলের একজন নেতা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কার্য পরিবেশ তৈরি করতে পারে? এ প্রশ্নগুলো প্রায়ই ব্যবস্থাপকদের ভাবায়। সফল ব্যবস্থাপক এ উত্তরগুলো জানে। দীর্ঘমেয়াদে সফলতার জন্য কর্মীদের উৎপাদনক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার বিকল্প আর কিছু নেই। কর্মীদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে প্রেষণাদান। প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা। প্রেষণাকে কতিপয় শক্তির সমষ্টি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বলা হয় যে, প্রেষণা হলো কতিপয় শক্তির সমাহার, যার কারণে মানুষ বিশেষভাবে আচরণ করে। প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে।[8] প্রেষণা একটি প্রয়োজন পূরণ (Need Satisfying) প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় অতৃপ্ত প্রয়োজন দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় টেনশন হ্রাসের মধ্য দিয়ে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

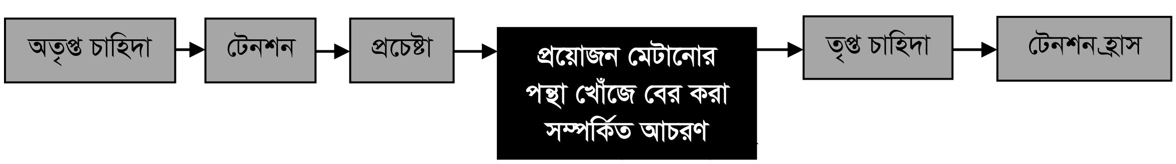

চিত্র ৭.৮ বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অনুপ্রেষিত (Motivated) ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বীয় উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কর্মসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব। মানুষের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হলে সে প্রেষিত (বা অনুপ্রেষিত) হয়েছে বলা যায়।

[8] জাহেদ মাননান (২০১৯), সাংগঠনিক আচরণ, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেষণার আদি তত্ত্বসমূহ

Early theories of motivation

প্রেষণা সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডারিক উইলিয়াম টেইলার (Frederick William Taylor), মাজলো (Maslow), হার্জবার্গ (Herzberg), ম্যাকক্লিল্যান্ড (McClelland) সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কর্মীদের প্রেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বহু কথা বলেছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো তত্ত্বই সার্বজনীনভাবে প্রেষণার একমাত্র 'মহৌষধ' হিসেবে গৃহীত হয়নি। সব তত্ত্বেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রেষণার তত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৫০ এর দশক ছিল ফলপ্রসূ সময়। এ সময়কালে তিনটি তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল। এ তত্ত্বগুলো ঐ সময় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিলো, যদিও কোনো তত্ত্বই প্রশ্নাতীত ছিলনা। এখনো কর্মীদের প্রেষণার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বগুলো সর্বাধিক পরিচিত। আসুন, প্রেষণা সম্পর্কিত বহুল আলোচিত তিনটি আদি তত্ত্ব সম্পর্কে আগে জেনে নেই এরপর সমসাময়িক তত্ত্বগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

⊙ **চাহিদা-সোপান তত্ত্ব (Hierarchy of needs theory):** ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক আচরণ সাহিত্যে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাজলোর (Abraham Maslow) চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি প্রেষণার একটি মৌলিক মডেল হিসেবে বিবেচিত। তিনি ব্যক্তির প্রয়োজনকে চাহিদার সোপানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এ তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদার একটি সোপান বিদ্যমান। চাহিদাগুলো পূরণ সাপেক্ষে একটির পর একটি পূরণে মানুষ সচেষ্ট হয়। এভাবে সে শেষ স্তরে এসে পৌঁছায়। এ চাহিদাগুলো মাজলো গুরুত্বসারে চিত্র ৭.৯- এর সাহায্যে দেখিয়েছেন:

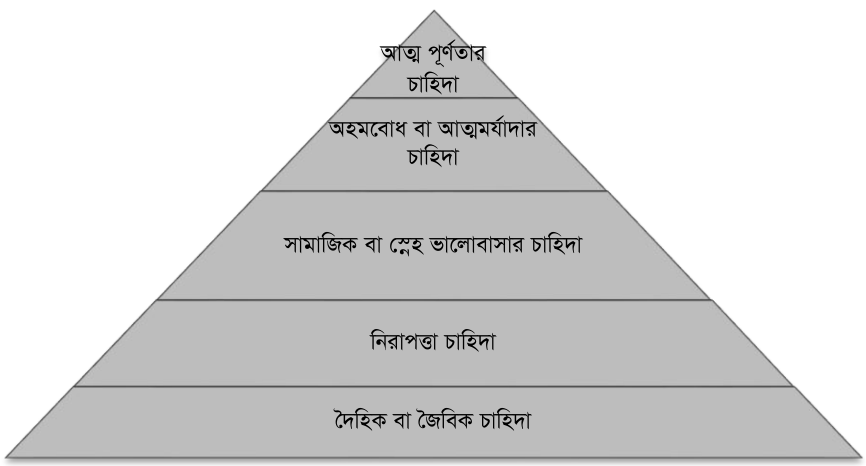

চিত্র ৭.৯: মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্ব

১. **দৈহিক বা জৈবিক চাহিদা (Physiological needs):** যেসব অভাব বা চাহিদা মানুষের দৈহিক বা জৈবিক, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য সেগুলো দৈহিক বা জৈবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন-ক্ষুধা, আবাস, পানীয়, বাসস্থান, বস্ত্র, যৌন সন্তুষ্টি এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন। মাজলোর মতে, এ চাহিদা পূরণ না করা পর্যন্ত উচ্চস্তরের চাহিদা পূরণ করে মানুষকে কাজের প্রতি প্রেষিত করা সম্ভব নয়।

২. **নিরাপত্তার চাহিদা (Safety needs):** যেসব চাহিদা মানুষের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার সাথে জড়িত সেগুলোকে নিরাপত্তার চাহিদা বলা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চাহিদাগুলো হচ্ছে- চিকিৎসা সুবিধা, চাকুরির নিরাপত্তা, আয়ের নিরাপত্তা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা, বার্ধক্যজনিত পেনশন ইত্যাদি। মাজলোর মতে, যখন দৈহিক ও জৈবিক চাহিদা মিটে যায় তখন নিরাপত্তার চাহিদার সৃষ্টি হয়, যা মানুষের আচরণকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।

৩. **সামাজিক চাহিদা (Social needs):** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষ বসবাস করে। ফলশ্রুতিতে, মানুষ বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রশংসা ও ভালোবাসা পেতে সর্বদা আগ্রহী থাকে। পারস্পরিক স্নেহ, মায়ামমতা, বন্ধুত্বের বন্ধন, অন্যের দ্বারা স্বীকৃতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সামাজিক চাহিদা হিসেবে গণ্য হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক চাহিদার সৃষ্টি হয় তার নিম্ন স্তরের চাহিদাগুলো নিবৃত্তির পর।

৪. **অহমবোধ বা আত্মমর্যাদার চাহিদা (Esteem needs):** এর মধ্যে রয়েছে মানুষের অভ্যন্তরীণ অহম উপাদান, যেমন-আত্মসম্মান, কাজের স্বাধীনতা ও কৃতিত্ব অর্জন এবং বাহ্যিক অহম-উপাদান (পদমর্যাদা ও অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ) ইত্যাদি। সামাজিক চাহিদা পূরণ হওয়ার পর মানুষের মান-মর্যাদা বা অহমবোধ চাহিদার উদ্ভব হয়।

৫. **আত্ম পূর্ণতার চাহিদা (Self-actualization):** মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্বে এর অবস্থান সর্বোচ্চ স্তরে। মানুষ তার সৃজনশীলতা এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের স্বপ্ন সবসময়ই লালিত করে। উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে চায়। এ জাতীয় চাহিদার মধ্যে রয়েছে শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ সেবা ইত্যাদি। এটি উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এ ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়না।

মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি পূরণ হলে আরেকটির অভাব দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষের অভাব অসীম। আবার একই সময়ে মানুষ একাধিক অভাবের দ্বারা তাড়িত হতে পারে। এ তত্ত্বের অনেক ইতবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বটি সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

⊙ **এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব (Theory X and Theory Y):** মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor) দুটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এক্স তত্ত্ব অনুযায়ী, কাজের প্রতি মানুষের স্বভাবগত অপছন্দ (disliking) রয়েছে- যার দরুন কর্মীরা সম্ভব হলে কাজ পরিহার করে চলতে চায়। অধিকাংশ মানুষ অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে পছন্দ করে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়। ফলশ্রুতিতে, কাজ হয়ে পড়ে গৌণ এবং সে কারণে কর্মীদেরকে দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপকদেরকে তৎপর হতে হয়। এ তত্ত্বটি একটি নিরাশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মানুষকে অলস, কর্ম-বিমুখ এবং ফাঁকিবাজ হিসেবে দেখা হয়েছে।

ওয়াই তত্ত্ব আশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, কাজ মানুষের কাছে খেলা বা বিশ্রামের মতোই স্বাভাবিক বিষয়। মানুষ কাজ করতে চায় এবং কাজ থেকে সন্তুষ্টি পায়। আরও মনে করা হয় যে, মানুষের শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করারই ক্ষমতা আছে তা নয়, তারা দায়িত্ব পেতেও চায়। তারা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার বিকাশ ঘটায় এবং সেগুলো প্রয়োগ করে। তাই কর্মীদের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপকদের কর্তব্য হলো, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে কর্মীরা আত্ম-উন্নয়নের সুযোগ পাবে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন।

⊙ **দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two-factor/Motivation-hygiene theory):** ১৯৫০ দশকের শেষ দিকে ফ্রেডারিক হার্জবার্গ (Frederick Herzberg) ও তাঁর সহযোগীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার ও একাউন্ট্যান্ট-এর কর্ম মনোভাব (Job Attitude) এর ওপর একটি গবেষণা পরিচালিত করেন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মীদের কাজে প্রেষণা দেওয়ার জন্য দুধরনের উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হলো:

(ক) প্রেষণামূলক উপাদান (Motivational factors)
(খ) হাইজিন উপাদান (Hygine factors)

প্রেষণামূলক উপাদান শ্রমিককর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সাফল্যের স্বীকৃতি, উন্নতির সুযোগ, প্রতিষ্ঠানের পলিসি, পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি প্রণোদনাদানকারী উপাদান। হার্জবার্গ মনে করেন, প্রেষণামূলক উপাদানগুলো তখনই ভালোভাবে কাজ করবে যখন প্রতিষ্ঠানে 'হাইজিন' উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকবে। এবার আসুন, হাইজিন উপাদানগুলো জেনে নেই। যে সকল উপাদান লোকজনের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সাথে জড়িত তাদেরকে হাইজিন উপাদান বলে। হাইজিন উপাদানগুলো কর্মীদের প্রণোদিত করে না। এগুলোর অভাবে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যেমন, তত্ত্বাবধান পরিবেশ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, কার্য পরিবেশ ও মর্যাদা ইত্যাদি।

কর্মঅসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে নির্মূল করতে পারলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে কাজের পরিবেশে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হবে ঠিকই, কিন্তু এতে কর্মীরা প্রেষণা পাবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবেনা। কর্মীদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা দিতে হলে 'মোটিভেটরস' প্রেষণাসৃষ্টিকারী উপাদানের ওপর ব্যবস্থাপককে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ তত্ত্বটি 'মোটিভেশন হাইজিন' নামেও পরিচিত।

প্রেষণার সমসাময়িক তত্ত্বসমূহ

Contemporary theories of motivation

সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে আদি তত্ত্বসমূহ। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ হচ্ছে এদের পর্যাপ্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বৈধ অনুসমর্থনকারী নথিপত্র। সাম্প্রতিককালে এ তত্ত্বগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে বলে এদেরকে ''সমসাময়িক তত্ত্ব'' বলা হয় বিষয়টি তা নয়, বরং এ তত্ত্বগুলো বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীদেরকে কীভাবে অনুপ্রেষিত করা উচিৎ তার ব্যাখ্যা সংগঠনগুলোর সামনে তুলে ধরেছে। এখানে আমরা বহুল প্রচলিত তিনটি সমসাময়িক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

⊙ **লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব (Goal-setting theory):** এডউইন লক (Edwin Locke) এ তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির কর্ম প্রেষণা ও কর্মসন্তুষ্টি তার প্রত্যাশা, চাহিদা, মূল্যবোধ ও মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল। এ তত্ত্বে সংগঠনের প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টাকে পরিচালিত এবং শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে।

লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব অনুসারে সুনির্দিষ্ট ও কঠিনতর লক্ষ্য অধিকতর ও উন্নতমানের কর্মসম্পাদনে কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা থাকলে এবং কর্মীদের নিকট তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলে তারা কাজে বেশি মাত্রায় অনুপ্রেরণা পায়। তারা বোঝতে পারে- কী করতে হবে এবং তা করার জন্য কতটুকু প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়াও লক্ষ্য যদি কঠিন হয় এবং তা যদি কর্মীরা বোঝেশোনে গ্রহণ করে, তাহলে সেই কঠিন লক্ষ্য সহজ লক্ষ্যের তুলনায় কর্মীদেরকে অধিকতর মাত্রায় অনুপ্রেষিত করে।

⊙ **সমতা তত্ত্ব (Equity theory):** ষাট এর দশকে J.S. Adams এ তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। প্রতিটি মানুষ ন্যায্য আচরণ পেতে আগ্রহী- এর ওপর ভিত্তি করে এ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। এ 'ন্যায্যতা' বলতে সমতা বা ভারসাম্যকে বোঝানো হয়েছে। আর অসমতা বলতে এ তত্ত্বে বোঝানো হয়েছে অপরের তুলনায় ব্যক্তি সমান আচরণ পাচ্ছেনা। কর্মীর প্রেষণা ব্যাখ্যার জন্য সে কীভাবে সামাজিক বিনিময় সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কর্মী নিজেকে তার সহকর্মীর সাথে তুলনা করে ন্যায্য আচরণ পাচ্ছে কীনা তা নির্ণয় করে থাকে।

সমতা তত্ত্ব কর্মীদের প্রেষণা দেওয়ার জন্য একটি কার্যকরী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে আপেক্ষিকতার প্রভাব রয়েছে। সমতা অসমতার তুলনা করা যে কোনো সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে, বিভিন্ন স্তরে প্রবলভাবে কাজ করে। এ কারণে, কর্মী তার প্রাপ্যতা সঠিকভাবে পেয়ে থাকলেও অন্যের সাথে তুলনা করার কারণে সে অসন্তুষ্ট হয়। এক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপকগণ অসমতাজনিত অসন্তোষ পরিহার করে ন্যায়সংগত সুযোগসুবিধা প্রদানপূর্বক কর্মীদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রেষণা দান করতে পারেন।

⊙ **প্রত্যাশা তত্ত্ব (Expectancy theory):** বর্তমানে প্রেষণায় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তত্ত্বটি হচ্ছে Victor H. Vroom-এর প্রত্যাশা তত্ত্ব যা তিনি ১৯৬৪ সালে উপস্থাপন করেন। এ তত্ত্বটি সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ প্রত্যাশার ভিত্তিতে অনুপ্রেষিত করে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে কর্মীর আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হলে সে অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করবে। Vroom এর মতে, যেকোনো কর্মীর প্রেষণা তার অনুমিত কাজের মূল্যের সাথে প্রত্যাশার শক্তির গুণন দ্বারা নির্ধারিত হয় যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে কর্মীকে সহায়তা করে। এ অনুমতি কাজ ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মকও হতে পারে। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, কোনো কাজের অনুমিত মূল্যের ফল হচ্ছে প্রেষণা। আরও সহজভাবে বলা যায়, সংগঠনের কর্মীরা কোনো কাজ সম্পাদনের আগে উক্ত কাজ শেষে কী পুরস্কার পেতে পারেন তা বিবেচনা করেন। কাজ শেষে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলে ঐ কাজের প্রতি তার চাহিদা বেড়ে যায়। তিনি তিনটি ধারণার মাধ্যমে প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। এগুলো হচ্ছে- আকর্ষণ, প্রত্যাশা এবং শক্তি।

এ তত্ত্বটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়-

$$\text{শক্তি} = \text{আকর্ষণ} \times \text{প্রত্যাশা}$$

$$\text{Force} = \text{Valence} \times \text{Expectancy}$$

এ তত্ত্বটি তিনটি সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে:

১. প্রচেষ্টা - কর্মসম্পাদন সম্পর্ক
২. কর্মসম্পাদন - পুরস্কার সম্পর্ক
৩. পুরস্কার - ব্যক্তিগত লক্ষ্য সম্পর্ক

এ বিষয়টি আমরা চিত্র ৭.১০- এর সাহায্যেও উপস্থাপন করতে পারি:

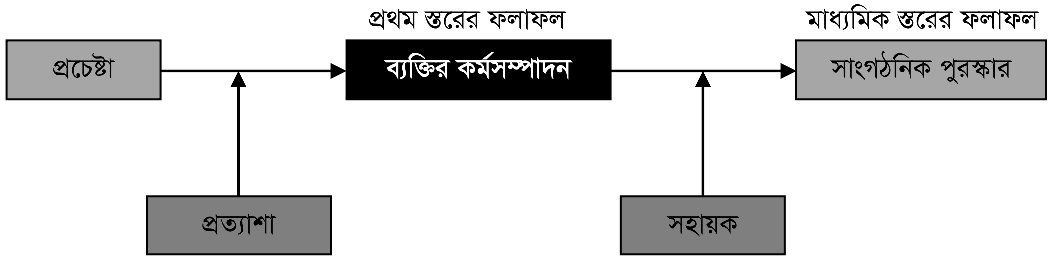

চিত্র ৭.১০: প্রত্যাশা তত্ত্বে ব্যক্তির কর্মসম্পাদনে বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক

'প্রত্যাশা' হচ্ছে একটি কাজের প্রতি কর্মীর বিশ্বাস যা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এ তত্ত্বে 'শক্তি' বলতে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীর অনুভূতি ও প্রেষণার সমন্বয়ে সৃষ্ট কর্মীর ইচ্ছা শক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া, 'আকর্ষণ' হচ্ছে কর্মীর আবেগজনিত ধনাত্মক মানসিক অবস্থা, 'সহায়ক' হচ্ছে কর্মসম্পাদন ও পুরস্কারের মধ্যকার সম্পর্ককে বোঝায়।

সারসংক্ষেপ

১৯৫০ এর দশকে তিনটি তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল - চাহিদা-সোপান তত্ত্ব, এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব এবং দ্বি-উপাদান তত্ত্ব। এ তত্ত্বগুলো ঐ সময় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিলো। এখনো কর্মীদের প্রেষণার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বগুলো সর্বাধিক পরিচিত। চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি ব্যক্তির প্রয়োজনকে চাহিদার সোপানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। এক্স তত্ত্ব একটি নিরাশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মানুষকে অলস, কর্ম-বিমুখ এবং ফাঁকিবাজ হিসেবে দেখা হয়েছে। থিওরি ওয়াই আশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, কাজ মানুষের নিকট খেলা বা বিশ্রামের মতই স্বাভাবিক বিষয়। অন্যদিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব অনুযায়ী যেসব উপাদান কর্মসন্তুষ্টির কারণ ঘটায় সেগুলো কর্মঅসন্তুষ্টির জন্য দায়ী উপাদানগুলো থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই কর্ম অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে নির্মূল করতে পারলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে কাজের পরিবেশে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হবে ঠিকই, কিন্তু এতে কর্মীরা প্রেষণা পাবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায়না। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে আদি তত্ত্বসমূহ। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ হচ্ছে এদের পর্যাপ্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বৈধ অনুসমর্থনকারী নথিপত্র। লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব অনুসারে সুনির্দিষ্ট ও কঠিনতর লক্ষ্য অধিকতর ও উন্নতমানের কর্মসম্পাদনে কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে। সমতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কর্মীর ন্যায্য আচরণের প্রাপ্যতা। কর্মক্ষেত্রে কর্মী নিজেকে তার সহকর্মীর সাথে তুলনা করে ন্যায্য আচরণ পাচ্ছে কি না তা নির্ণয় করে থাকে। প্রত্যাশা তত্ত্বটি সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ প্রত্যাশার ভিত্তিতে অনুপ্রেষিত করে থাকে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. মূল্যবোধ কী? মূল্যবোধের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. "মনোভাব এবং মূল্যবোধ একই জিনিস নয়, কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত" - আপনি কি একমত? মনোভাব ধারণাটি আলোচনা করুন।
৩. কর্মসন্তুষ্টি এবং কর্মসম্পাদন কি একে অপরের পরিপূরক? আলোচনা করুন।
৪. যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।
৫. কয় ধরনের যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৬. বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।
৭. নির্দেশনা ও নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে? আলোচনা করুন।
৮. "নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজন"- বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৯. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মূলত তিন প্রকারের নেতৃত্ব-স্টাইলের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়? সবগুলো ধরন আলোচনা করুন।
১০. লক্ষণ তত্ত্ব, আচরণ তত্ত্ব এবং পরিস্থিতিগত তত্ত্বের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১১. মোহনীয় নেতৃত্ব এবং রূপান্তরী নেতৃত্বের মধ্যকার সম্পর্ক এবং পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।
১২. প্রেষণা কী? প্রেষণার আদি তত্ত্বগুলো আলোচনা করুন।
১৩. প্রেষণার সমসাময়িক তত্ত্বগুলো কী? আলোচনা করুন।